জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-২৯

SIAM OF PROPHET HAZRAT MOHD

সিয়াম রাসূলুল্লাহর রোজা

ডা. জাকির নায়েক

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

সিয়াম
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রোযা

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মনিরুজ্জামান খান
বি এস এস (অনার্স) অর্থনীতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিস পাবলিকেশন–ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সিয়াম (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোযা ,

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক ঃ কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৪/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984-70256-19

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Ramadan :Dr. Zakir Naik Translated By Moniruzzaman Khan
Published By Md. Rafiqul Islam,
Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 50.00

সূচিপত্র

প্রশ্ন : মহানবী ﷺ ইফতারে কী খেতেন? রোজা ছাড়ার জন্য কী খেতেন?

প্রশ্ন : ডা. জাকির রোজা ছাড়ার জন্য খাবার গ্রহণের আগে কোনো নির্দিষ্ট দোআ বা কোনো নির্দিষ্ট ঘোষণা থাকলে তা কী?

প্রশ্ন : একজন প্রশ্ন করেছেন যে, সাহরির সময়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোআ আছে কিনা?

প্রশ্ন : কোনো লোক যদি রোজা রাখার নিয়ত করে ঘুমালো কিন্তু কোনো কারণে যেমন ঘুম থেকে না জাগতে পারার কারণে সেহরী খেতে পারলো না, তাহলে সে কি রোজা রাখবে?

প্রশ্ন : ডা. জাকির, রাসূল ﷺ কি সেহরীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট খাবার-দাবারের কথা উল্লেখ করেছেন কী?

প্রশ্ন : রোজার সময় যেসব কাজ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং যেসব কাজ সুন্নতের পরিপন্থী তা উল্লেখ করবেন কি?

প্রশ্ন : রমজান মাসে কোন কোন কাজ নাজায়েয করা হয়েছে?

প্রশ্ন : ডা. জাকির, কেউ যদি তার জবান বা জিহ্বাকে সংযত না করে তাহলে কি রোজা অর্থহীন হবে না?

প্রশ্ন : রোজা রেখে যদি কেউ তার জিহ্বার হেফাজত না করে তা হলে তার কি পাপ হবে?

প্রশ্ন : রোজার মাসে গীবত ও পরনিন্দার পরিণাম কী?

প্রশ্ন : ডা. জাকির, রমজান মাসে ইসলামি তথা দ্বীনি ইলম অর্জনে শিক্ষার প্রতি কেন এতো বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে?

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন হলো– গান বাজনা সম্পর্কে অনেক মুসলমান বলেন যে, গান বৈধ, আপনি কি রাসূল (স.)-এর কোনো বক্তব্য পেশ করবেন না Music নিষেধ করে?

প্রশ্ন : এর আগে আমরা রোজার উদ্দেশ্য আলোচনা করার সময় রোজার আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উপকারিতা আলোচনা করেছিলাম। আপনি কি রোজার অন্য উপকারিতাগুলো আলোচনা করবেন?

রোজার মানসিক উপকারিতা

রোজার সামাজিক উপকারিতা

রোজার সময় অনুমোদিত কার্যাবলি

প্রশ্ন : ডা. জাকির, রোজা অবস্থায় মহিলারা কী খাবার জিহ্বায় দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে?

প্রশ্ন : আমার প্রশ্নটি অ্যালকোহল প্রয়োগ সম্পর্কিত। চোখে সুরমা দেওয়া সম্পর্কে আমরা জানি যে, চোখে সুরমা দেওয়া সুন্নাত। রোজার সময় সুরমা ব্যবহার করা কি জায়েয?

প্রশ্ন : আতর বা পারফিউম ব্যবহার করা (রোজা অবস্থায়) কি জায়েয?

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া কি জায়েয?

প্রশ্ন : মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে, নাকের ড্রপ, জিহ্বাতে কোনো ওষুধ ব্যবহার করা বা বিভিন্ন প্রকার, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কি রোজা অবস্থায় জায়েয হবে।

প্রশ্ন : রোজার সময় কারো সন্দেহ হলো যে, এটা তার রোজা ভেঙ্গে দিতে পারে, রোজা অবস্থায় সন্দেহ হলে নিয়ম কী?

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে পড়লো যে, তাকে রোজা ভাঙতে বাধ্য করা হলো কিংবা নিয়ম-কানুনের সম্পর্কে না জানার কারণে সে রোজা ভেঙ্গে ফেললো।

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় কি টুথপেস্ট ব্যবহার করা জায়েয?

প্রশ্ন : অযু করার পর বা মুখ ধোয়ার পর অনেকে থুথু ফেলতে থাকে। এ বিষয়ে বিধান কী?

প্রশ্ন : যদি কেউ এজমাতে ভোগে তাহলে সে কি অক্সিজেন, ইনহিলার বা অন্য কোনো ট্যাবলেট ব্যবহার করতে পারবে?

প্রশ্ন : রোজার সময় অনুমোদিত ও যেসব কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে সেগুলো কী কী?

প্রশ্ন : একজন লোক উদারতা মহত্ত্ব কিভাবে বুঝবে? উদারতা বলতে কী বুঝায়? একজন মুসলমান রমজান মাসে উদারতার জন্য কী কী কাজ করবে?

প্রশ্ন : ড. জাকির, রোজার মাস হলো ক্ষমার মাস এবং আল্লাহ আমাদেরকে এ মাসে পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল হতে বলেছেন। আপনি কি আরো ব্যাখ্যা করবেন?

প্রশ্ন : এবারের প্রশ্ন রাগান্বিত হওয়া সম্পর্কিত। ডা. জাকির, রমজান মাস হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ করার মাস। রোজার মাসে কোনো রোজাদার রাগান্বিত হওয়ার জন্য কি কোনো অজুহাত দেখাতে পারে? অর্থাৎ রোজাকে তার রাগ হওয়ার অজুহাত হিসেবে দেখাতে পারে কিনা। অর্থাৎ সে বললো, আমি রোজা রাখার কারণে রাগান্বিত।

প্রশ্ন : ডা. জাকির রোজার মাসে ওমরা পালন করা উত্তম বলা হয়েছে। এ বিষয়ে কি কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে?

প্রশ্ন : ডা. জাকির অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, রোজা অবস্থায় মেসওয়াক করা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে (মাকরূহ) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন?

প্রশ্ন : ডা. জাকির কীভাবে একজন ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে জ্ঞান অর্জন করতে পারে?

প্রশ্ন : ডা. জাকির, হুসনুস মুলুক দ্বারা কী বুঝায়? এবং "তোমার পরিবারের নিকট ভালো হও" দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

রমযানের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ

১. জৈব বিষ (Toxin) ধ্বংস হয়
২. শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে
৩. ওজন ও মেদ-ভুঁড়ি কমে এবং এযেইমার্স (ALZHEIMER'S) রোগ থেকে বাঁচা যায়
   অর্ধ সাপ্তাহিক রোযা ও আইয়ামে বীদের রোযার তাৎপর্য
৪. রোযার ফলে হজম ও পরিপাক যন্ত্রগুলো বিশ্রাম লাভ করে পতিত জমির মতো নূতন শক্তি অর্জন করে
৫. রোযা কিডনীতে পাথর সৃষ্টিতে বাধা দেয়
৬. চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়
৭. বাত রোগের চিকিৎসা
৮. রক্তে কোলেস্টেরল কমায়
৯. রক্ত স্বল্পতা ও রক্ত শূন্যতা দূর হয়
১০. কঠোর স্নায়ু ব্যথার উপশম হয়
১১. ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে
১২. রোযা সকল Infection এবং টিউমারের জন্য প্রতিরোধক
১৩. হায়াত বাড়ে ও বার্ধক্য দেরীতে আসে
১৪. পুরুষ হরমোন বৃদ্ধি পায়
১৫. দাঁত ও মাড়ির উপকার হয়
১৬. পেপটিক আলসার হ্রাস পায়
১৭. তারবাহীর নামায মেরুদণ্ডের Flexibility বাড়ায়
১৮. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়
১৯. যৌন রোগ থেকে বাঁচা যায়
২০. স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে
২১. রমযান মাসে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যার পরিমাণ হ্রাস পায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশ্ন : রোজার প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন, আপনি কি 'তাকওয়া' ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : আলহামদুল্লিাহ। 'তাকওয়া'-এর ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি এমন একটি সরু পথ দিয়ে যাবেন যার দুধারে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এ পথ দিয়ে আপনি যখন চলবেন তখন আপনার চাদর বা পোশাক কাঁটায় আটকে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এ কাঁটাযুক্ত পথে হাঁটার সময় আপনার চাদর বা পোশাক কাঁটা থেকে বাঁচিয়ে আপনার চলার যে প্রচেষ্টা 'তাকওয়া' বিষয়টি সে রকম। অর্থাৎ নানা প্রকার বাঁধা ডিঙিয়ে সঠিক এবং সুন্দরভাবে চলার প্রচেষ্টা। ভাষাগত দিক দিয়ে 'তাকওয়া' শব্দটি আরবি ভাষার وقى থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো ভয়, বেঁচে থাকা। কোনো কিছু হতে বিরত থাকা, রক্ষা করা, ভীত হওয়া। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ হলো আল্লাহ ভীতি, ইসলামি বিধান মতে তাকওয়া হলো ব্যক্তির অনুভূতির একটি অবস্থা, আল্লাহ সম্পর্কে ব্যক্তির আত্মিক অনুভূতি। প্রভু সম্পর্কে সতর্কতা, আল্লাহকে স্মরণ। আল্লাহর সর্বদা উপস্থিতি এবং তার জ্ঞানের পরিধি যে সর্বময় সে সম্পর্কে সতর্কতা। এসব বোধ, অনুভূতি ব্যক্তিকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং সৎকাজে ব্রতী করে তুলবে। তাকে ধার্মিক করে তুলবে। এটাই হলো তাকওয়া। তাই মানুষ সংক্ষেপে একে আল্লাহভীতি হিসেবে অনুবাদ করে থাকে। একে 'আধ্যাত্মিকতা'ও বলা হয়।

তাকওয়া সম্পর্কে কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আলে-ইমরানের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই 'মুসলমান' না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং তারা ইসলামের উপরই

মৃত্যুবরণ করবে। ইসলামের উপর থাকতে হলে তাকওয়ার উপরই থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল ﷺ থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হলো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোনো কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা– কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃজ্ঞ না হওয়া। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের গুণাবলীই হলো তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ নিকট সেই গুরুত্বপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ যার তাকওয়া আছে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হলো তাকওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ সূরা হুজরাতের ১৩নং আয়াতে বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۔

অর্থ : হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে, আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন। তাকওয়্যাবান, আল্লাহর নিকট প্রিয়, সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্য তাকওয়াই হলো মাপকাঠি। আল্লাহর নিকট সম্ভ্রান্ত হওয়ার, প্রিয় হওয়ার জন্য বিবেচ্য বিষয় নয়, বয়স, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, অর্থ, সম্পত্তি; বরং এটা হলো তাকওয়া। এটা হলো আল্লাহভীতি, আল্লাহ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকা। জ্ঞান, প্রজ্ঞাবান হওয়া, অন্যের চেয়ে সম্ভ্রান্ত হওয়ার একমাত্র বৈশিষ্ট্যগুলো তাকওয়া অর্জনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, বিশেষ করে তারা যখন কোনো অভিযানে যেতেন তখন সবসময়ই বলতেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাকওয়া অর্জন কর এবং তারা তা অনুসরণ করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁর পথ ও উপদেশ অনুসরণ করেছেন। যেমন হযরত উমর (রা) তার ছেলে হযরত আব্দুল্লাহকে বলেছেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তাকওয়ার পথ অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। তিনি আরো বলেন, তুমি যদি আল্লাহর পথে ব্যয় কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন এবং তুমি যদি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।

কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকওয়া অর্জনের পথ নির্দেশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাকওয়া হলো এমন একটি বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি যার জন্য আমল কবুল হয় অর্থাৎ তাকওয়া কর্ম কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। আল্লাহ্ সূরা আহ্জাবের ৭০, ৭১ নং আয়াতে বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ـ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

অর্থ : হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।

আল্লাহ্ এভাবে আবারও বলেছেন সূরা মায়েদার ২৭ নং আয়াতে।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ তাদের কর্মই কবুল করবেন যাদের তাকওয়া আছে। অর্থাৎ তাকওয়ার পথ অনুসরণকারীদের কাজই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

তাকওয়া সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়

এরপর আল্লাহ্ বলেন যে, ঐ ব্যক্তিরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে যারা তাকওয়াবান, খোদাভীরু।

সূরা আলে-ইমরানের ৭৬ নং আয়াতে বলেন,

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : তাকওয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এটা ক্ষমালাভের উপায়। তাকওয়ার কারণে আল্লাহ্ বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ বলেন, যে তাকওয়া থাকার কারণ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব। তাকওয়ার কারণে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রতিদান বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে সূরা তালাকের ৫ নং আয়াতে বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا ـ

অর্থ : তাকওয়ার ৪র্থ দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের তাকওয়া আছে তথা যারা তাকওয়াবান, আল্লাহভীরু আল্লাহ তাদের সরল পথ দেখাবেন এবং বিপথগামী, গোমরাহী থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ সূরা আনফালের ২৯ নং আয়াতে বলেন,

اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ـ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে ফুরকান স্থান দান করবেন। ফুরকানগণ হলো ভালোমন্দ বোঝার শক্তি, ভালো মন্দ বিবেচনার ক্ষমতা, অনেক আলেম– মত প্রকাশ করেছেন যে, ফুরকান অর্থ হলো সিরাতুল মুসতাকিম তথা আল্লাহর পথ। আবার অনেকে বলেন, সরল পথ, জান্নাতের পথ।

সূরা হাদীদের ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও তাকওয়ার পরিচায়ক, আল্লাহ সূরা হজ্জের ৩২ নং আয়াতে বলেন,

فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

অর্থ : তাকওয়া কীভাবে অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কে আল্লাহ সূরা বাকারার ২১ নং আয়াতে বলেন,

আল্লাহ সূরা ইউনুসের ৬২ ও ৬৩ নং আয়াতে আরো বলেন,

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থ : সুতরাং বুঝতেই পারবেন, উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসে তাকওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

রোজার উদ্দেশ্য

রোজা যেভাবে একজন ব্যক্তিকে জান্নাত পাওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলবে, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক সূরা বাকারা ১৮নং আয়াতে বলেন–

অর্থাৎ, এর অর্থ হলো তোমারা রোজাঁর মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে পারো এবং তাকওয়াই হলো জান্নাতে যাওয়ার পথ। (আল্লাহ্) সূরা আহজাবের ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন–

এ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ্ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। এ আয়াতে যারা জান্নাত যাওয়ার যোগ্য তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৬৬১ নং হাদীসে এসেছে; মহানবী ﷺ বলেন, 'যে নারী সঠিকভাবে নামাজ আদায় করবে, রোজা রাখবে, নিজের সম্ভ্রম হেফাজত করবে এবং নিজের স্বামীকে মান্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, (তিরমিযী শরীফ, দোআ অধ্যায়ের ৩৫ নং হাদীসের বর্ণনা, "একদা মহানবী ﷺ মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং তিনবার 'আমীন' বললেন। তখন সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি তিনবার আমীন বললেন, তখন তিনি জবাবে বললেন, জিবরাইল (আ) আগমন করে আমাকে বললেন, যে ব্যক্তি রমজান মাস পেয়েও তার গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না সে দুর্ভাগা, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি (জিবরাইল) আমীন বললেন, সাথে আমিও তিনবার আমীন বললাম।"

সহীহ্ ইবনে হিকয়াম এবং রোজা অধ্যায়ের ৩৪৩ নং হাদীসে এসেছে, একজন লোক মহানবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলো এবং তাঁকে বললো, আমি আল্লাহর ইবাদাত করি এবং মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস করি, নামাজ আদায় করি, যাকাত দিই এবং রমজান মাসের রোজা রাখি, তাহলে আমি কার সঙ্গী হব? আমার প্রতিদান কী হবে? মহানবী ﷺ বললেন, তুমি নবী ও শহীদদ্বয়ের সঙ্গী হবে। অর্থাৎ তুমি জান্নাতে যাবে।

সুনানে তিরমিযী শরীফের ঈমান অধ্যায়ের ২৬১৬ নং হাদীসে এসেছে,

'একজন ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, আমি কি কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবো? রাসুল ﷺ বললেন, এটা কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ চাইলে তার বান্দার জন্য সহজ করে দিতে পারেন। তাহলো, আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, যাকাত আদায় করা, রমজান মাসের রোজা পালন করা। তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসনাদে আহমদ-এর ৫ম খণ্ডের ২২২৪৯ নং হাদীস। এটি সুনানে নাসায়ীতেও উল্লেখ করা হয়েছে সহীহ্ জামে তিরমিযী হাদীস

নং ৪০৪৪, খণ্ড নং ২, হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মহানবী ﷺ -এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবো, তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি রোজা রাখো, এর মতো অন্য কিছু নেই।

সুতরাং মহানবী ﷺ রোজাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সর্বোত্তম আমল বলেছেন এবং আরও বলেছেন এর মত অন্য কিছু নেই। সহীহ বুখারীর অন্য একটা হাদীস, ৩য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ১৮৯৯ নং হাদীসে এসেছে। রাসূল ﷺ বলেন, রমজান মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে বেধে রাখা হয়। সহীহ বুখারীর অন্য আরেকটি হাদীস, ৩য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ১৮৯৬ নং হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, জান্নাতের একটি দরজা আছে যার নাম 'রাইয়ান'। যারা রোজাদার তারাই কেবল এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। যারা রোজা রাখে না তারা এ দরজা অতিক্রম করতে পারবে না। আল্লাহ সেদিন বলবেন, কারা রোজাদার ছিলে, তারা দাঁড়াও। তখন রোজাদারগণ দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যারা রোজা রাখে নি তাদেরকে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সুতরাং আপনি যদি জান্নাতে যেতে চান তাহলে রোজা পালন করুন, আপনি এই রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আপনার নিকট থেকে জানতে চাই যে, রোজার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?

উত্তর : الحمد لله। রোজার অনেকগুলো উদ্দেশ্য আছে। আমি কেবল প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করবো। ১ম উল্লেখ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ২য় হলো তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া হলো আল্লাহর সম্পর্কে ভীতি, সচেতনতা, আল্লাহ সর্বদা, সর্বাবস্থায় বিরাজমান সে সম্পর্কে সচেতনতা, আল্লাহভীতি। আপনি যদি তাকওয়া অর্জন করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন। সেজন্য বলা যেতে পারে, প্রথম উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সরাসরি জড়িত। একটি অর্জন করলে অন্যটি অর্জন হয়ে যায়। তৃতীয় হলো জান্নাতে যাওয়া, চতুর্থ হলো পাপ থেকে বিরত থাকা। পঞ্চম হলো আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা। ষষ্ঠ হলো গুনাহ ক্ষমা পাওয়া। আপনি যদি রোজা পালন করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। ৭ম হলো শিক্ষা অর্জন তথা বিনয়-নম্রতা অর্জন করা। আপনি যদি রোজা রাখেন তাহলে আপনি সংযম হবেন, বিনীয় হবেন, অনুশোচনা করবেন, সংযম করা আপনার জন্য ফরজ। ৮ম নাম্বার হলো আল্লাহর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হওয়া। ৯ম হলো আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করা, ইচ্ছার উপরে

আধ্যাত্মিক শক্তিকে বৃদ্ধি করা। ১০ম হলো সৎকাজ করা। ১১তম হলো সততা অর্জন করা। ১২তম হলো আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করা, লোভ কমানো, লিপ্সা কমানো। ১৩তম হলো To normal the passage of act font of the font is normal of the city. ১৪তম হলো To act as রোজা হলো ঢালের মত, কাজ করা, রোজা মুমিনের জন্য ঢালস্বরূপ। ১৫তম হলো বাজে বা অশ্লীল কথা থেকে বিরত রাখা।

প্রশ্ন : যদি যে কেউ রোজা রাখে তাহলে তার পক্ষে সম্ভব যে, রোজার সবগুলো উদ্দেশ্য অর্জন করা?

উত্তর : যদি কেউ সঠিকভাবে সত্যিকারই রোজা পালন করে এবং সঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে সবগুলো লক্ষ্য পূরণ রকতে সমর্থ্য হবে। কিন্তু যারা রোজা রাখে তাদের সবাই এসব উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। কেন? কোনো লোক যখন কাজ করে তখন তাতে দুটি বিষয় জড়িত থাকে। তার মধ্যে প্রথমটি হলো পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হলো উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যেক মানুষ খায়। কেন খায়? রোজা হলো খাওয়ার মতো, দ্বিতীয় হলো কেন খাওয়া হলো। খাওয়ার উদ্দেশ্য, খাওয়ার কাজের মধ্যে চারটি অংশ আছে, ১ম হলো খাদ্য তৈরি, ২য় হলো মুখে দেওয়া, তৃতীয় হলো মুখে চিবানো, ৪র্থ হলো গলাধকরণ, কিন্তু লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্য, জীবন রক্ষা। মানুষ খায় কারণ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং জীবন ধারণ। এভাবে কাজ ও উদ্দেশ্যের সাথে যদি মিল না থাকে তাহলে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাথে যদি পদ্ধতির মিল না থাকে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন কেউ বানু সামান নিলো, খাওয়ার জন্য তৈরি করলো, মুখে দিল, চিবিয়ে পিষলো। অতঃপর গলাধকরণ করলো। আপনার কি মনে হয় তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে? সে কি বেঁচে থাকবে ও স্বাস্থ্য কি রক্ষা পাবে? সুতরাং কিছু কিছু বিষয় আছে যা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দরকার হয়। একইভাবে পান, পানাহার ও যৌনক্রিয়া এসব সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকার সাথে রোজার আরো কিছু কাজ করতে হয় যা আমি আগেই আলোচনা করেছি। যেমন– যা যা থেকে বিরত থাকতে হয়, কোন কোন কাজে বিরত থাকতে হয় এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য, কোনো ব্যক্তি সঠিকভাবে কাজ করলো, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলো। উদাহরণস্বরূপ আপনি যে খাবার খাবেন তা অবশ্যই স্বাস্থ্যকর হতে হবে। আপনি যদি স্বাস্থ্য রক্ষা করতে চান তাহলে আপনি খাবেন যা স্বাস্থ্যকর হয়। আপনি তাহলে স্বাস্থ্যকর ভালো স্বাস্থ্য পেলেন, আপনার লক্ষ্য পূরণ হলো। অন্যদিকে একজন ভালো খাবার খেলো। খাবার সামনে নিলো, মুখে দিলো, চিবালো অতঃপর গলাধকরণ করলো অথচ কিছুক্ষণ পর গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেললো। তাহলে তার কি লক্ষ্য পূরণ হবে? না হবে না।

একইভাবে আহার, পান, যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা। এবং আপনি যদি বমি করে দিন তাহলে সকল উপকার নষ্ট হয়ে যাবে। এটা একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যায়। যেমন একজন লোক গ্রাম থেকে শহরে এলো। সে বললো যে, আমি আমেরিকা যাব। হ্যাঁ ঠিক আছে। টিকিট ক্রয় করা। আমেরিকা যাওয়ার প্রধান কাজ হলো টিকিট কাটা এবং প্লেনে ওঠা। এটাতো খুব সহজ, সে লোকটি এয়ারপোর্ট গেল তখন তারা বললো, পাসপোর্ট কোথায়। তখন সে বললো, পাসপোর্ট আবার কী? তখন সে ফিরে গেল পাসপোর্ট তৈরি করলো। কিছুদিন পর আবার এয়ারপোর্ট গেল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি 'ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স' নিয়ে এসেছেন। তখন সে বললো, এটা কী? কোনো কোনো দেশ 'ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স' পায়। সে ফিরে গেল এবং আই.এম লিখে। সে বললো, ধরুন আমার তখন USA যেতে হবে। সুতরাং আমাকে আমেরিকা যাওয়ার প্রধান কাজ হলো টিকিট কাটা। এটা তো খুবই সহজ।

অতঃপর সে পাসপোর্ট করলো, টিকিট কাটলো। I.L নিলো এবং এটি show করলো, তখন তাকে 'বডিং কার্ড' দেওয়া হলো। তখন ইমিগ্রেশনে বললো, আপনার ভিসা কোথায়? ভিসাও দরকার? সে আবারও ফিরে এলো এবং ভিসা সংগ্রহ করলো। যদিও USA ভিসা খুবই কঠিন। সে শেষে এটা পেলো। আমেরিকা যাওয়ার মূল কাজ হলো কীভাবে আমেরিকা যাওয়া যায়। এটা হলো টিকিট কাটা এবং প্লেনে চড়ে কাল যাওয়া। প্রধান কাজ হলো, বিমান চড়া এবং এর জন্য টিকিট কাটা। কিন্তু এর সাথে আরো পূর্বশর্ত হলো, পাসপোর্ট, ভিসা, ইমিগ্রেশন রেফারেন্স ছাড়া এসব প্রয়োজন। একজন লোক অন্য দেশে পাসপোর্ট ছাড়া যাতায়াত করতে পারে না। ভিসা ছাড়া অন্য দেশে প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং একজন লোক এসব পাওয়ার জন্য তার অবশ্যই এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু আসল বিষয় হলো, বোম্বে USA টিকিট কেনা। কিন্তু টিকিট কেনার পর এবং সবকিছু করার পরও একজন লোকের জন্য, সে যদি রোজা রাখে তাহলে তাকে পান, পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকতে হয়। তাকে তারও যেসব থেকে বিরত থাকতে হবে যদি পূর্ণ সুফল পেতে হয়। তাহলো অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। এবং যেসব বিষয় হারাম তা থেকে বিরত থাকা। তাহলে সে রোজার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

এখন বলবো, ঐ ব্যক্তি আমেরিকা গেল, কিন্তু তার যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? লোক USA যেতে পারে পড়ার জন্য। কেননা এ দেশটি পড়াশুনার জন্য খুবই উপযুক্ত। আবার কেউ যেতে পারে প্রকৃতি দেখতে। আসতে যেতে পারে প্রতিভা বৃদ্ধির জন্য,

কেউ যেতে পারে মাদকের জন্য, মদ আনতে যেতে পারে, সমকামিতার জন্য, কেননা USA তে সমকামিতা বৈধ। তাই বলা যায় কোন উদ্দেশ্যে সে সেখানে যাচ্ছে সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে আবার USA-তে যায় Jambling-এর জন্য। সুতরাং একটি বিষয় হলো আমেরিকা যাওয়ার উদ্দেশ্য। মুসলমান রোজা রাখে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই। তারা রোজা রাখে দেখাদেখি, ইচ্ছামতো। ফলে তারা রোজার আসল উদ্দেশ্য যেমন তাকওয়া অর্জন, জান্নাত লাভ, পাপ থেকে মুক্তি এসব অর্জন করতে পারে না। তারা রোজা রাখে, খানা-পিনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু রোজার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। একজন লোক আমেরিকা যেতে পারে, পতিতা বৃত্তিক যৌনচারের জন্য, Jambling এর জন্য, মদ পানের জন্য, ড্রাগস-এর জন্য, সে তার লক্ষ্য অর্জন করলো। যে উদ্দেশ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে যেতে যায় পড়ালেখার জন্য। সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে কেন সে রোজা রাখছে। সঠিকভাবে এর যাবতীয় জড়িত বিষয়গুলো আমল করে তাহলে তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে। আর তারা যদি তা না করে তাহলে মহানবী ﷺ-এর স্বয়ং হাদীস ইবনে মাজা, রোজা অধ্যায় খণ্ড-৩ হাদীস নং ১৬৯০ তিনি বলেন, 'অনেক লোক আছে যারা রোজা রাখে, কিন্তু ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট ছাড়া তাদের কোনো প্রতিদান নেই। অনেকে নামাজে দাঁড়ায় তাদের জন্য নির্ঘুম জেগে থাকা ছাড়া কোন প্রতিদান নেই।'

প্রশ্ন : খাদ্য, পানীয় ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। রোজার আসল উদ্দেশ্য কী তা বলবেন কি?

উত্তর : সংক্ষেপে, রোজার প্রধান তথা এক বাক্যে যদি বলতে হয় তাহলে এগুলো হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ পালন। আপনি যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের এ নির্দেশ পালন করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি অন্য সকল নির্দেশ সহজেই পালন করতে পারবেন। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, দুদিন আগেই আলোচনা করেছি বিভিন্ন টপিক, Ream murded and discourage acts well fasting and if you remember me ware discussed 32 points in the topic of recommended well fountain and 29 points in Audi with are discourage well fasting. দুটি মিলে মোট ৬১টি পয়েন্ট। আমরা ৬০টিরও অধিক বিষয়ে আলোচনা করেছি যা recommended এবং discourage যা আমাদের করতে হয়। সংক্ষেপে কিছু বিষয় high light করার জন্য কিছু আয়াত বলাটা যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ বলেন, এটা সহীহ বুখারিতে উল্লেখ করা হয়েছে খণ্ড-৩। রোজা অধ্যায়, হাদীস নং ১৯০১। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি

যদি পুরো রজমান মাস রোজা রাখলো আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর প্রতিদান সন্তুটি পাওয়ার জন্য তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তাই রোজা হলো আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং তার সন্তুটি অর্জন এবং প্রতিদান পাওয়াই আসল বিষয়। আরো উল্লেখ সহীহ বুখারীর খণ্ড নং ৩। রোজা অধ্যায়, হাদীস নং ১৮৯৪। তিনি বলেন Fasting is a sheild. তিনি একইভাবে অন্য হাদীস সহীহ বুখারীর খণ্ড-৩, রোজা অধ্যায় হাদীস নং ১৯০৪ নং এ বলেন, Fasting is shield, If you রোজা হলো ঢাল, এটা তোমাকে রক্ষা করবে এবং পাপ থেকে বিরত রাখবে। মহানবী আরো বলেন, রোজা অধ্যায় হাদীস নং ১৯০৩, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি Enter Altion এবং Futer speech ত্যাগ করতে পারলো না, আল্লাহর নিকট তার না খেয়ে, না পান করে থাকার দরকার নেই। এখানে এ হাদীসে প্রধান কাজগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো দু ধরনের এক প্রকার হলো, Fulls speech এবং অন্যটি হলো False action. False speech সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো ঝগড়া, sundring, মিথ্যা বলা, Double abuns. অশ্লীল কথা বলা, গল্প False action হলো, যা আমাদের মধ্যে প্রায় করে থাকে, যেমন অশ্লীল গান শোনা, বাদ্যযন্ত্র, গানবাজনা শোনা, অশ্লীল বই পড়া। কিছু অশ্লীল ছবি দেখা, অপর একই সূত্রে গাঁথা, আমি আগেই চাল্লাম করেছি বিভিন্ন প্রশ্নের মানে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুনানে ইবনে মাজাহ খণ্ড. 3 রোজা অধ্যায় হাদীস নং ১৬৯০। এখানে বলেন, অনেক লোক আছে, রোজা রাখলে ক্ষুধা পিপাসা ছাড়া প্রতিদান কিছুই পায় না, অনেক নামাযি আছে, যারা রাতজাগা নির্ঘুম রাত জাগার কষ্ট ছাড়া কিছুই পায় না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, সুনানে ইবনে, মাজা, হাদীস নং ৪২৫০, খণ্ড-৫, যদি কেউ আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তার পাপ থেকে এবং রমজান মাস যেহেতু গুনাহ ক্ষমার মাস। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। এটা মুসনাদে আহমদ-এর ২য় খণ্ড হাদীস নং ৬৬২৩ এ বলা হয়েছে, দুটি বিষয় তওবার জন্য প্রয়োজন। ১মটি হলো, This person left his desire of eating driaghing and sex for me. So I will into for him. In the Quran say, that this person he captuse is the Quran and prevint rendig from sleeping. So I interseed on his pionts.

সুতরাং কুরআন এবং রোজা intersed for you on the jurdeyeand and insalhad you get thip.

প্রশ্ন : এবারের প্রশ্ন হলো আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন, রোজা হলো আমার জন্য, আর এর প্রতিদান আমি নিজেই নিষ্ঠা এর ব্যাখ্যা আসলে কী হবে?

উত্তর : অনেকগুলো সহীহ হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহর এ বাণীর ব্যাপারে, বুখারী শরীফ ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৮৯৪, ১৯০৪ রোজা অধ্যায় এখানে তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন, বনী আদমের সব কাজই তার জন্য, রোজা ব্যতীত, রোজা আমার জন্য। এর অর্থ হলো অন্য সব কাজই এটা হতে পারে নামাজ, এটা হতে পারে যাকাত, হজ্ব, এসবই দেখানোর জন্য কেবল করা যেতে পারে। সবই রিয়ার জন্য করা যেতে পারে। কিন্তু রোজা হলো এমন কাজ কোনো লোক ইচ্ছা করলেই সে আড়ালে যেয়ে কাউকে না দেখিয়ে সহজেই খেয়ে নিতে পারে। সুতরাং কেউ যদি প্রকৃত রোজা রাখে তা কেবল আল্লাহর জন্যই। এটা দেখানোর জন্য, রিয়ার জন্য হতে পারে না। তাই আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, আদম সন্তানের সব কাজই তার জন্য, কেবল রোজা আমার জন্য। এ জন্য অন্য একটি হাদীসে সুনানে নাসায়ী রোজা অধ্যায়, হাদীস নং ২২২৩, মহানবীর সাহাবী হযরত আবু উমামা (রা) মহানবীর ﷺ নিকট এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন. আমাকে বলবেন কি কোন কাজ করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন? মহানবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি রোজা রাখো।

এ কারণে অন্য হাদীসে সহীহ মুসলিমের রোজা অধ্যায়ের ২৫৬৭ নং হাদীসে বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক কাজই তার নিজের জন্য। যে নিজের জন্য কাজ করল তার জন্য সে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান পাবে। কিন্তু রোজা হলো আমার জন্য এবং এর জন্য আমি নিজেই প্রতিদান দিব। কেননা সে আহার, পানীয় এবং কামনা, বাসনা আমার জন্যই ত্যাগ করে, তাই তিনি বলেন, তিনি নিজেই প্রতিদান দিবেন। তার অর্থ হলো রোজা হলো এক গুণ। এটার প্রতিদান পাব অশেষ গুণের। তাই বলেন, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।

প্রশ্ন : রোজাকে কেন মহানবী ﷺ 'ঢাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আপনি এ ব্যাপারটি দয়া করে আরো ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝাবেন।

উত্তর : মহানবী ﷺ বোখারী শরীফের রোজা অধ্যায়ের ১৮৯৪ নং হাদীসে বলেন, "রোজা হলো ঢালের মতো। একই কথা তিনি অন্য হাদীসে বলেছেন, হাদীস নং ১৯০৪। রোজা অধ্যায়, "রোজা হলো তোমাদের জন্য ঢালস্বরূপ। ইহা তোমাদেরকে রক্ষা করে Helpiree এবং পাপের পথ থেকে দূরে রাখে। যে কারণে

প্রিয় নবী ﷺ একথা বলেছেন। কারণ, যখন কোনো ব্যক্তি খায় এবং পেট যখন ভরা থাকে তখন অন্য কাজ করার জন্য চিন্তা করতে পারে। যার অনেকগুলো হতে পারে হারাম বা ভুল কাজ। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন সে হারাম বিষয়ে চিন্তা করতে পারে না। মনে করুন আপনি ক্ষুধা নিয়ে সিনেমা দেখতে পারবেন? গান শুনতে পারবেন? তাই ক্ষুধা ব্যক্তিকে পাপ করা থেকে বিরত রাখে। এ কারণে নবী ﷺ রোজাকে ঢাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহানবী ﷺ আরো বলেছেন, সহীহ বুখারীর জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ২৮৪০। কোন ব্যক্তি যদি একদিনের জন্য রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ দিনের দূরত্বে রাখবেন। অন্য হাদীস তিরমিজি শরীফের জিহাদ অধ্যায়ের ১৬২৪ নং হাদীসে বলেন, "কোনো ব্যক্তি যদি ১ দিনের জন্য রোজা রাখে তাহলে তার এবং জাহান্নামের মধ্য এমন ব্যবধান।

কারণ রোজা খারাপ কাজ, খারাপ চিন্তা, বাজে কথা থেকে বিরত রাখে। এজন্য মহানবী ﷺ রোজাকে ঢাল বলেছেন। আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিই, এটা বুখারী শরীফ ৩য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ১৯০৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত তাদের বিবাহ করা উচিত। কারণ......।'

সুতরাং রোজা মানুষকে বাজে চিন্তা থেকে বিরত রাখে। মনকে অশ্লীল কাজে করার চিন্তা থেকে বিরত রাখে, আপনি যখন আসলেই ক্ষুধার্ত থাকবেন তখন আপনি অন্যায়ের কাজ করার চিন্তা করতে পারবেন না। এ কারণে মহানবী ﷺ একে ঢাল বলেছেন।

প্রশ্ন : সাহরি এবং ইফতার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর : 'সুহুর' শব্দটি আরবি শব্দ সাহর سحر থেকে উপত্তি। যার অর্থ হলো "রাতের শেষ" ভাগ এবং এর বিপরীত শব্দকে বলা হয় عشار ইশার। আর শব্দ সুহুর অর্থ হলো সুবহে সাদেকের পূর্বে খাবার গ্রহণ। আরবি শব্দ সুহুর আরো যে অর্থ প্রকাশ করে তাহলো সাহরি গ্রহণ করা তথা সাহরীর খাবার খাওয়ার কার্যক্রম। সাহরি খাওয়ার জন্য যেসব কাজ করা হয় তা সুহর হলো একটি কাজ এবং সুবহে সাদেকের পূর্বে খাবার গ্রহণ, একইভাবে আরবি শব্দ ইফতার আরবি فطر (ফাতর) থেকে উৎগত। যার অর্থ হলো ভঙ্গ করা, ছিঁড়ে ফেলা। আর ফেতর অর্থ হলো এমন খাদ্য যা দ্বারা রোজা ভঙ্গ করা হয়। আরবি শব্দ 'ইফতার' অর্থ হলো রোজা ভঙ্গ করা হয়। **অর্থাৎ ইফতার অর্থ হলো রোজা ভাঙ্গার জন্য খাদ্য গ্রহণ।**

প্রশ্ন : ডা. জাকির সুবহে সাদেকের পূর্বে সেহরী খাওয়ার গুরুত্ব/মহত্ত্ব কী?

উত্তর : মহানবী ﷺ-এর বাণী অনুসারে যা সহীহ বুখারীর রোজা অধ্যায়ের ১৯২৩ নং হাদীসে এসেছে। অত্র হাদীসে মহানবী বলেছেন, সেহরী হলো রাতের শেষ ভাগের সুবহে সাদেকের পূর্বের খাবার গ্রহণ এবং এটা রহমত স্বরূপ। সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য হাদীসে এসেছে, রোজা অধ্যায় ৩ং খণ্ড, হাদীস নং ২৪১৩। যেখানে বলা হয়েছে মুসলিম ও আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সুবহে সাদিকের সাহরি সেহরী গ্রহণ। অর্থাৎ সহরি খাওয়া হলো আহলে কিতাব আর মুসলমানদের রোজার মধ্যে পার্থক্যের নিদর্শন। সিলসিলা আল সহিয়াহ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১০৪৫ নং হাদীসে আরো উল্লেখ আছে– মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহর রহমত বরকত তিনটি জিনিসের উপর পতিত হতে থাকে। প্রথম হলো যাকাত, ২য় হলো আওতারিদ তথা তৃতীয়ত হলো সুহর সাহরি। তথা সুবহে সাদেকের পূর্বে আহার গ্রহণ। একই গ্রন্থের অন্য হাদীস, হাদীস নং ১২৯১-তে উল্লেখ করা হয়েছে। মহনবী ﷺ বলেন, রহমত বরকত শুধু দুইটি বিষয়ের জন্য। প্রথম হলো সেহরী, ২য়টি হলো সঠিক পরিমাপ। আরো অনেকগুলো হাদীস আছে যেখানে প্রিয়নবী ﷺ সেহরীর ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

সহিহ আল জামের ১ম খণ্ডের ৩৬৮৩ নং হাদীসে এসেছে, একজন সাহাবী মহানবী ﷺ কে সেহেরীর ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন প্রিয় নবী ﷺ বললেন, সেহরীতে অনেক বরকত রয়েছে। সুতরাং তোমরা একে বাদ দিয়ো না। মুসনাদে আহমদ এর একটি হাদীস খণ্ড নং ১৭, হাদীস নং ১১০৮৬। এ হাদীসে নবী ﷺ বলেন, সেহরী হলো রহমত স্বরূপ। তাই তোমরা এটাকে বাদ দিয়ো না। অন্তত এক গ্লাস পানি দিয়ে হলেও সাহরি কর। কেননা যে ব্যক্তি সাহরি খায় আল্লাহ তাকে নিজ হাতে রহমত দান করেন। একই কথা সুনানে আবু দাউদের সহিহ হাদীসে এসেছে সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড নং-২, রোজা অধ্যায় হাদীস নং ২৩৩৭। একজন লোক মহানবী ﷺ নিকট সাহরির সময় এলেন। তখন মহানবী ﷺ তাকে বললেন, সেহরী খাও। কেননা এটা হলো আল্লাহর রহমত স্বরূপ। 'সাহরির সময়টা হলো বরকতময়।' সাহরির ফজিলত সম্পর্কে আগের অনেকে হাদীসে এসেছে। এটা উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। এটা একটি নিয়ামত। তাই মহানবী ﷺ এটা ত্যাগ করেন নি। বরং সর্বদাই সাহরি খেয়েছেন। তাই মুসলিমদের জন্য উচিৎ হবে রোজা রাখলে অবশ্যই সেহরী খাওয়া এবং নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না হওয়া।

প্রশ্ন : সাহরি খাওয়ার ব্যাপারে সুবহে সাদেকের পূর্বেই খাওয়ার সম্পর্কে কুরআন নির্দেশ আসে কখন? এই নির্দেশ আমার পূর্ব সাহাবীগণ কীভাবে রোজা রাখতেন, কখন এটা শুরু হলো?

উত্তর : কুরআনে নির্দিষ্টভাবে সেহরী সম্পর্কে নির্দেশ আসার পূর্বে সাহাবীগণ তাদের পূর্বের অভ্যাস মতো রোজা রাখতেন। তারা আহলে কিতাবগণ যেমন রোজা রাখত, তাদেরকে অনুসরণ করতো। অতঃপর সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আহলে কিতাবদের অনুসরণ করতেন। এটা হাদীস থেকে জানা যায় যে, কীভাবে সাহরির প্রচলন হলো, তারা ১৮৭ নং আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে কীভাবে রোজা রাখতেন তা বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়। তখন তারা ইফতারের পর পরই খাবার খেতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন এবং পরবর্তী দিনের ইফতার পর্যন্ত আর কিছুই খেতেন না এবং পরবর্তী দিনের সূর্যাস্তের পরই খাবার খেতেন। তারা প্রথম দিকে রোজা পালন করতেন তা সহীহ বুখারীর রোজা অধ্যায়ের খণ্ড নং ৩-এর ১৯১৫ নং হাদীসে এসেছে, সেখানে একজন সাহাবী যার নাম কায়েস ইবনে সালমান আল আনসারী এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একদিন তার বাড়িতে আসলেন ইফতারের সময় এবং তার স্ত্রীকে বললেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত। আমাকে ইফতারের জন্য খাবার দাও। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, ঘরে কোনো খাবার নেই। বাইরে থেকে কোনো খাবার সংগ্রহ করে আনো। তখন তিনি বের হয়ে গেলেন খাবার আনার জন্য। এসময় এ সাহাবী (রা.) খুব ক্লান্ত ছিলেন এবং ফিরে এলেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। তখন তার স্ত্রী ফিরে এসে দেখলেন তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন তার স্ত্রী বলতে লাগলেন এখন আমি কী করবো? আমাদের তো কোনো খাবার নেই। তখন তিনি পরবর্তী দিনেও না খেয়েই রোজা রাখলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লো – এ খবর রাসূল ﷺ-এর নিকট গেল এবং তখন কী হয়েছে তা জানতে চাইলেন। এমন সময় সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াত নাজিল হয়। এখানে বলা হয়েছে,

يَسْـئَلُوْنَكَ عَـنِ الْاَهِلَّةِ - قُلْ هِىَ مَـوَاقِـيْتُ لِلنَّـاسِ وَالْحَـجِّ - وَلَـيْسَ الْبِـرُّ بِاَنْ تَـاْتُـوا الْبُـيُـوْتَ مِنْ ظُهُـوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِـرَّ مَنِ اتَّـقٰـى - وَاْتُوا الْبُـيُـوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : তাই এই আয়াত নাজিল হওয়ার আগে রোজা রাখার কিছু পার্থক্যতো ছিলই। তারা সাহরি খেতেন না। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্তমান পদ্ধতি চালু হয়।

প্রশ্ন : ১৮৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করবেন? [এই আয়াতের অর্থ... ।

উত্তর : এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময় এর অর্থে ব্যাখ্যা হাদীসে এসেছে। এ আয়াত যখন নাজিল হলো তখন সাহাবীগণ এর অর্থ বুঝতে পারলেন, এ সম্পর্কে বুখারী শরীফের রোজা অধ্যায়ের ৪৫০৯ (খণ্ড নং-৬) হাদীসে বলা হয়েছে, একজন সাহাবী সে দুটি সুতা নিয়ে এলো। একটি সাদা এবং একটি কালো এবং সে...... । সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে তাকবীর অধ্যায়ের ৪৫১০ নং হাদীসে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে একজন সাহাবা দুটি সুতা নিলেন। একটি কালো সুতা, অন্যটি সাদা সুতা নিলেন এবং যে তার ঐ সুতা দিয়ে তার পায়ের আঙ্গুল বাধলো....... । এবং যখন সাহাবী (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, সাদা সুতা ও কালো সুতার মধ্য পার্থক্য কি? তখন মহানবী ﷺ তাদের বুঝালেন, সাদা হলো সুবহে সাদেকের আলো........ । তখন এ আয়াত নাজিল হওয়া সম্পূর্ণ হলো এবং 'সুবহে সাদেক' শব্দটি তখন নাজিল হল। প্রথম নাজিল হয় তোমরা রাতের অন্ধকার থেকে ভোরের সাদা আলো হওয়া পর্যন্ত। তখন আল্লাহ্ এই আয়াত এ দুয়ের মধ্যে নাজিল করেন।

মহানবী ﷺ দুই ফজর ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ১ম ফজর হলো তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমরা দিগন্ত রেখায় সোজা আলো দেখতে পাবে যা শেয়ালের লেজের মতো। এটা প্রথম ফজর। ২য় ফজর হলো অর্থাৎ দুটো ফজরের মধ্যে ২য় হলো– এটা দিগন্ত রেখায় তথা আকাশের দিকে লালিমা দেখা যায়। যা আপনি পাহাড়ের মাথায়, ঘরবাড়ি, রাস্তায় দেখা যায়। এটা হলো প্রকৃত ফজর। এটা হলো সুবহে সাদেকের শেষ মুহূর্ত। এ সময় অবশ্যই সাহরি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

এ বিষয়ে সহীহ বায়হাকীতে মহানবী ﷺ বলেছেন, ১ম ফজরে তোমাদের পানাহার থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করা হয় নি। এবং এ সময় ফজর নামাজ আদায় বৈধ নয়। আর ২য় ফজর যখন পানাহার নিষিদ্ধ এবং ফজর নামাজ হলো বৈধ। এখানে দুই ফজরের মধ্যে পার্থক্য বলা হয়েছে। অন্য হাদীস সুনানে আবু দাউদ ২য় খণ্ডে রোজা অধ্যায়ের ২৩৪৮ নং হাদীসে বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, মানুষকে খেতে, পান করতে দাও এবং তাদেরকে পানাহার থেকে বিরত রেখ না। যতক্ষণ সাদা রেখা লম্বালম্বি আকাশে দেখা যায় এবং ততক্ষণ লাল আলো আনুভূমিকভাবে

আকাশে দেখা যায়। এটা হলো প্রকৃত ফজর। এর সমর্থনে আরো অন্য হাদীসে এসেছে, সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ২৪০৮ নং হাদীসে, ২৪০৭ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। সুতরাং কুরআনের এ রাতের কালো ও সাদা রেখার পার্থক্য আলোচনা করা হলো।

প্রশ্ন : ডা. জাকির, সাহরি খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে কি? এ সম্পর্কে সুন্নাতের আলোকে আমাদেরকে বলবেন কি? রাসূল ﷺ কি এর কোনো নির্দিষ্ট সময় বলে দিয়েছেন?

উত্তর : যতদূর বলা যায়, সাহরি তথা যা সুবহে সাদেকের পূর্বে খাওয়া হয় তা মধ্যরাত থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া যায়। যেমন কুরআনের একটি আয়াত আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ـ

অর্থ : .... তোমরা সাদা রেখা বিকশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পানাহার করতে পার...।

ফলে আপনারা মধ্যরাত থেকে সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় খেতে পারেন। কিন্তু প্রিয় নবী ﷺ এর সুন্নতানুযায়ী সাহরি যত দূর সম্ভব দেরী করে খাওয়া যায় ততই ভাল। কেবল সুবহে সাদেকের আগ মুহূর্ত খাওয়া ভালো। এটাই রাসূলের পছন্দ। এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে, একটি হাদীস মুসানাক ইবনে আবু সায়রা থেকে, খণ্ড-২, হাদীস নং ৯০৫৭। যেখানে একজন লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন যে, সে সুবহে সাদেকের সময় সাহরি করেছে। সে যখন মনে করেছে যে সুবহে সাদেকের সময় হয়েছে। এ অবস্থায় তার রোজা হবে কি? সে সেহরী খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, তাই ঐ সময় পর্যন্ত সেহরী খেতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদেক হয়।

সহীহ বুখারীর রোজা অধ্যায়ের ৩য় খণ্ডের ১৯১২ নং হাদীসে এসেছে, যায়েদ বিন সাবিত (রা) বলেন, রাসূল ﷺ সেহেরী খাওয়ার পর সালাত আদায় করতেন। তখন (যায়েদ ইবনে সাবেত) রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, সেহরি এবং আযানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কতটুকু হবে? তখন প্রিয় নবী ﷺ উত্তরে বললেন, এটা এমন সময় যা কুরআনের ৫০টি আয়াত তিলাওয়াত করতে যে সময় লাগে।

সহীহ বুখারীতে ৩য় খণ্ডের অন্য দুই হাদীস ১৯১৪ ও ১৯১৯ নং হাদীসে আরো উল্লেখ আছে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আযান শুনতে পাবে, হযরত বেলাল (রা) যখন নামাজের জন্য আযান দিতে থাকে নামাজের জন্য ডাকতে থাকে তোমরা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ো না। যতক্ষণ আযান শেষ না হয়। ইবনে মাখতুম বলেন, সে ততক্ষণ আযান দেয় না যতক্ষণ সুবহে সাদেক না হয়। এর অর্থ সুবহে সাদেক পর্যন্ত খাওয়া জায়েয। এটা সেহরীর শেষ সময়। সেহরী দেরী করে খাওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস এসেছে। সহীহ হাদীসে এসেছে। এই হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা ইফতার করার জন্য ব্যস্ত হও। তাড়াতাড়ি কর, আর সেহরী খাওয়ার জন্য দেরী কর। "অন্য হাদীসে আরো উল্লেখ করা হয়েছে সহীহ হাদীস, বায়হাকীর ৪র্থ খণ্ড, রোজা অধ্যায় হাদীস নং ৮১২৭ যেখানে বলা হয়েছে, সাহাবীগণ দ্রুত এবং ব্যস্তভাবে ইফতার করতেন এবং শেষ মুহূর্তে সেহরী খেতেন। আল বায়হাকীর ৪র্থ খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ৮১২৫ নং হাদীসে আরো উল্লেখ করা হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে হবে। এবং শেষ মুহূর্তে সেহরী খেতে হবে এবং তোমরা তোমাদের ডান হাত বাম হাতের উপর রাখ নামাজের জন্য। তাই এ হাদীসে অতি গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে যত দেরী সেহরী খাওয়া যায় ততই ভালো। মধ্যরাত থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সেহরীর সময় কিন্তু উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে যতদূর সম্ভব দেরী করে সেহরী খাওয়া যায় ততই উত্তম।

প্রশ্ন : ডা. জাকির, কোনো কোনো লোক বিশ্বাস করে যে, আযানের সময় পানাহার করা জায়েয, আপনি কি বলবেন যে এটা আসলেই ঠিক?

উত্তর : কোনো কোনো মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, ফজরের আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পান করা জায়েয। আবার অনেক লোক আছেন যারা শেষ আযান পর্যন্ত খেতে থাকেন এবং তারা শেষ আযান শোনার জন্য অপেক্ষা করেন। কোনো কোনো এলাকায় চার-পাঁচ জায়গা থেকে আজান শোনা যায়। অনেক লোক আছেন যারা বাড়ি থেকে অনেকগুলো মসজিদের আযান শুনতে পান এবং শেষ আযান শোনার জন্য অপেক্ষা করেন এবং তারা শেষ আযান পর্যন্ত খেতে থাকেন, শেষ আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা পানাহার করতে থাকেন। এ বিষয়টি কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীসে দ্বারা এটা প্রমাণিত নয়। দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো বিষয় আবিষ্কার করা সঙ্গত নয়। এটা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা

সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের শান্তি প্রতিষ্ঠা অধ্যায়ের ২৬৯৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করে, নতুন কোনো কিছু প্রবেশ করায়, এটা অবশ্যই বাতিল হবে। মূলত এটা সূরা বাকারার ১৪৭ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "........ আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।"

অর্থাৎ, এর অর্থ হলো যতক্ষণ সুবহে সাদেক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যখন আযান শুরু হয়। এটা অন্য একটি হাদীস যা সহীহ বুখারীর রোজা অধ্যায়ের ৩য় খণ্ডের ১৯১৮ ও ১৯১৯ নং হাদীসে বলা হয়েছে। যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ আযান শুনতে পাচ্ছ ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া করা যায়। যতক্ষণ তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শুনতে পাচ্ছো ততক্ষণ খেতে থাক। তাই যখন আজান শোনা যাবে তখন সেটা হলো ফজরের সময় অর্থাৎ যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে তখন খাওয়া বন্ধ করে দিবে। কিন্তু মহানবী ﷺ এক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিয়েছেন, এটা সুনানে আবু দাউদের একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ২য় খণ্ড, রোজা অধ্যায় হাদীস নং ২৩৪৩। রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা যখন খাওয়া অবস্থায় আযান শুনতে পাও তাহলে অর্থাৎ তোমাদের হাতে খাবার বা পানীয় থাকা অবস্থায় যদি আযান শুনতে পাও তাহলে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নাও। তৃপ্তি মেটাও।" এর অর্থ হলো তোমরা নিজেদের তৃপ্তি করার জন্য এ অবস্থায় খাওয়া বৈধ। অর্থাৎ মহানবী ﷺ এক্ষেত্রে এ ছাড় দিয়েছেন, বিবেচনা করেছেন যখন কারো হাতে খাবার রয়েছে তা খাওয়া অবস্থায় সে আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে তার খাওয়া শেষ করার সুযোগ দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, এটা ছাড় দেওয়া হয়েছে যে, আপনার হাতে বিশাল একটি ফল বা অনেক খাবার আছে যা শেষ করার অনুমতি আছে তা নয়। বরং আপনার খাবার অল্প বাকি আছে তা শেষ করা যাবে। তা হতে পারে ১ গ্লাস পানি বা পাত্রের বাকি অল্প খাবার। এটা এমন নয় যে, আপনি শোনার সময় বড় বার্গায় পানীয় শরবত সাত্ত উচ্চ নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন এবং তা আযানের পরেও কয়েক মিনিটে খাওয়া চালাতে থাকলেন। কোনো হাদীসই এ ব্যাপারে বলে নি। কারণ, আযান শুরু হওয়া মানে ফজরের সময় শুরু হয়ে যাওয়া। যখনই সুবহে সাদিক শেষ হবে তখনই আযানের সময় হবে। যখনই অযান শোনা যাবে তখনই খাওয়া দাওয়া শেষ করতে হবে।

প্রশ্ন : ডাঃ জাকির রোজা ভাঙ্গা তথা ইফতার করার সর্বোত্তম সময় কোনটা?

উত্তর : রোজা ছাড়ার তথা ইফতার করার সর্বোত্তম সময় হলো যখন রাত শুরু হয়। এটা যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ... যখন সূর্যাস্ত হবে তখনই রোজা ছাড়ার তথা ইফতারের উপযুক্ত সময়, সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ১৯৫৪ নং হাদীসে এ সম্পর্কে এসেছে যেখানে রাসূল ﷺ বলেন, যখন তোমরা রাত শুরু হতে দেখবে, তোমাদের দৃষ্টিতে দিনের শেষ হতে দেখবে এবং সূর্যাস্ত যাবে তখন তোমরা রোজা ছেড়ে দাও।

অন্য একটি হাদীস সহীহ বুখারীর রোজা অধ্যায় হাদীস নং ৪৫, খণ্ড নং-৩। আবু সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রোজা ছাড়তাম যখন আমরা দেখতাম সূর্যাস্ত গেছে। মহানবী ﷺ তাই করতেন।

সহীহ জামে ১ম খণ্ড ২৮৩৫ নং হাদীসে সহীহ হাদীসে আরো বলা হয়েছে– মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা রোজা ছাড়তে জলদি কর অর্থাৎ তাড়াতাড়ি রোজা ছাড়ো এবং দেরি করে সাহরি খাও।

বায়হাকী শরীফের অন্য একটি সহীহ হাদীসের বর্ণনা এসেছে– ৪র্থ খণ্ড, রোজা অধ্যায় হাদীস নং ৮১২৭। রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ দ্রুত তথা আগে আগে ইফতার করতেন এবং শেষ মুহূর্তে সেহরী খেতেন। আল বায়হাকী শরীফের ৪র্থ খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ৮১২৫ নং হাদীসে আরো এসেছে রাসূল ﷺ বলেন, আমাদের নবীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাড়াতাড়ি রোজা ছাড়তে এবং সেহরী খেতে দেরী করত। দেরী করে সেহরী খেতে বলা হয়েছে এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে বলা হয়েছে নামাজের জন্য। আরো অনেক হাদীস আছে যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে দেরী করে সেহরী খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ১৯৫৭ নং হাদীসে এসেছে– রাসূল ﷺ বলেন, আমার উম্মতগণ সঠিক পথে থাকবে যতক্ষণ তারা আগে আগে রোজা ছাড়বে।"

সহীহ ইবনে হিপান, রোজা অধ্যায়, খণ্ড নং ৮, হাদীস নং ৩৫১০, এ হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, আমার উম্মতগণ সেই সময় পর্যন্ত সুন্নাতের উপর থাকবে যতক্ষণ তারা রোজা ছাড়তে দেরী করবে না।

এই গ্রন্থের আরেকটি হাদীস নং ৩৫০৯, মহানবী বলেন, আমার এ দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতগণ রোজা ছাড়তে ব্যস্ততা করবে।

এবং যতক্ষণ তারা ইহুদিদের মতো রোজা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে এবং রোজা ছাড়তে দেরী করবে। সুতরাং এসব সহীহ হাদীস থেকে বুঝলাম যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোজা ছাড়া যায় ততই ভালো। এটা সূর্যাস্তের পরপরই।

প্রশ্ন : অন্য একটি প্রশ্ন করবো। অনেক লোক আছেন যারা দেরী করে রোজা ছাড়ে এবং দেরীতে মাগরিব নামাজ পড়ে। এরা সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেলে রোজা ছাড়ে ও মাগরিবের নামাজ পড়ে। তারা তাদের পক্ষে যুক্তি দেয় যে, তারা রোজা রক্ষা তথা সন্দেহ ত্যাগ করার জন্য এমন করে। এটা কি সঠিক? এটা কি যৌক্তিক?

উত্তর : অনেক মুসলমান আছে যারা চায় যে, তাদের রোজা হেফাজত করার জন্য এবং তারা বিশ্বাস করে যে, তারা অন্যদের চেয়ে তিন-চার মিনিট দেরীতে ইফতার করে সূর্যাস্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পরও তারা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এমন করে থাকে। কেননা হাদীসে এসেছে, সহীহ আল তারগীব, রোজা অধ্যায় ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৯১। সেখানে বলা হয়েছে, মহানবী ﷺ স্বপ্ন দেখেন যে, স্বপ্ন সম্পর্কে বললেন এবং তিনি উঠে গেলেন এবং সেখানে জনগণকে চিৎকার, আর্তনাদ করতে দেখলেন। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের কী হয়েছে? তাকে বলা হলো তারা জাহান্নামী মানুষ। তিনি অন্য পাশে দেখলেন এবং বললেন, এই লোক কারা? তখন জবাব দিলেন এরা তাড়াতাড়ি রোজা ছাড়তো। সুতরাং এই হাদীস অনুযায়ী, মানুষ সাবধানতাবশত যে ৫-৬ মিনিট দেরি করে তা সুন্নত নয়। দেরী করে ইফতার করা যেমন ভুল, তাড়াতাড়ি ইফতার করাও ভুল। কেননা কুরআনের সূরা বাকারায় ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।"

সহীহ বুখারী রোজা অধ্যায়ের (৩য় খণ্ড) ১৯৫৪ নং হাদীসে এসেছে রাসূল ﷺ বলেন, যখন তোমরা রাতের শুরু দেখতে পাবে যখন দিন শেষ হবে এবং যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন তোমরা ইফতার কর।"

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদীস যেমন সহীহ বুখারীর ৩২ খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ৯৫৫৭ নং হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, আমার উম্মতগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যের পথে থাকবে যতক্ষণ তারা তাড়াতাড়ি রোজা ছাড়বে। এটা সহীহ ইবনে হিব্বানের ৮ম খণ্ডের রোজা অধ্যায় ৩৫১০ নং হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নতে উপর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতার করতে দেরি করবে না। একই হিব্বানের ৩৫০৯ হাদীসে এসেছে মহানবী ﷺ বলেন, আমার দ্বীন

ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতগণ রোজা ছাড়াতে ব্যস্ত থাকবে। তাড়াতাড়ি করবে এবং তারা আহলে কিতাব ইহুদী খ্রিষ্টানদের মতো দেরি করবে না।"

কিন্তু এটা স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, এটা সূর্যাস্তের আগে নয়। এটা সূর্যাস্তের পর। আপনি সূর্যাস্তের পূর্বে রোজা ছাড়তে পারবেন না। আপনি যে মুহূর্তে দেখবেন নিজের চোখে সূর্যাস্ত হলো বর্তমানে তো ঘড়ি বা অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে সূর্যাস্তের সঠিক সময় জানা অতি সহজ। তখন রোজা ছাড়বেন। সুতরাং ৪–৫ মিনিট দেরী করার কোন দরকার নেই। আর সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ৫–৬ মিনিট দেরী করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যদি তেমন করেন তাহলে তো মহানবী ﷺ তো বলেই দিয়েছেন, যে দেরী করবে সে আমার সুন্নাতের উপর থাকবে না। তাই সঠিক সুন্নতের উপর থাকতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই সঠিক সময় ইফতার করতে হবে। সুন্নত অনুযায়ী সঠিক সময় হলো সূর্যাস্তের সাথে সাথে রোজা ছাড়তে হবে, দেরী করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : মহানবী ﷺ ইফতারে কী খেতেন? রোজা ছাড়ার জন্য কী খেতেন?

উত্তর : এটা সুনানে আবু দাউদের ২য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ২৩৪৯ নং হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ ইফতারে ভালো খেজুর খেতেন, উত্তম খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি টাটকা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। টাটকা খেজুর খাওয়া সর্বোত্তম। আর যদি তা না পান তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করুন। আর তাও না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করুন। এটাইতো সুন্নত। যদি কোনো পানি না পান তাহলে আপনি কোনো হালাল খাবার পান তা দিয়ে ইফতার করতে পারেন। যদি আপনি কোনো খাবার না পান যেমন আপনি ভ্রমণে কোনো যানবাহন থাকেন তাহলে আপনি শান্ত মানসিকভাবে রোজা ছাড়ার নিয়ত করুন। তাড়াতাড়ি আপনি যদি কোনো খাবার পান তা তখন খেয়ে নিন।

প্রশ্ন : ডা. জাকির রোজা ছাড়ার জন্য খাবার গ্রহণের আগে কোনো নির্দিষ্ট দোআ বা কোনো নির্দিষ্ট ঘোষণা থাকলে তা কী?

উত্তর : মুসলিমরা ইফতারের খাবার খাওয়ার আগে যেসব দোআ পড়ে তা অধিকাংশ সহীহ হাদীসে এসেছে। তারা যেসব দোআ ইফতার খাওয়ার সময় পড়ে। তার মধ্যে একটি হলো সুনানে আবু দাউদ-এর ২য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ২৩৫০

নং হাদীস। এখানে রাসূল ﷺ পড়তেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -

অর্থ : 'পিপাসা দূর হয়েছে., শিরা সিক্ত হয়েছে, পুরস্কার নিশ্চিত।'

যদি আল্লাহ্ চান তাদের অনেকে এই দোয়া ইফতার খাওয়ার আগে পড়ে থাকে। অর্থাৎ অনেকে এই দোআ ইফতার খাওয়ার পর পড়ে থাকে। আসল বিষয় হলো আপনি খাবার মুখে দেওয়ার আগে 'বিসমিল্লাহ' পড়বেন। এটাই রাসূল ﷺ পড়তেন। তারপর আপনি খেজুর, অন্যান্য খাবার ও পানি খাওয়ার পর তিনি এই দোআ পড়বেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -

অর্থাৎ আমার পিপাসা দূর হয়েছে। কেবল পানি পান করার পরই যা পিপাসা দূর হয়। পানি পান করার আগে তো পিপাসা দূর হওয়ার কথা নয়। খেজুর, খাবার পানি অন্যান্য খাদ্য খাওয়ার পরই আমার পিপাসা, ক্ষুধা দূর হয়েছে। প্রতিদান নিশ্চিত, ইনশাআল্লাহ।

আরো অনেকগুলো হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে রাসূলে ﷺ .... 'বিসমিল্লাহ' বলে ইফতার করতেন এবং এরপর বিভিন্ন দোআ পড়তেন। যেসব দোআ বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। ইবনে মাজার একটি হাদীসে এসেছে ৩য় খণ্ড, রোজা অধ্যায় হাদীস নং ১৭৫২। রাসূল ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তির দোআ নিশ্চিত রূপে কবুল হয়, তাহলো 'ন্যায়পরায়ণ শাসক, ইমাম বা নেতার দোআ।' রোজাদারের দোআ যখন সে দোআ করে ইফতারের সময় এবং মজলুমের দোআ। ইবনে মাজার একই অধ্যায়ের ১৭৫৩ নং হাদীসে একই কথা বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রোজা রাখে তার দোআ কবুল করা হয় যখন সে ইফতার করে।" তাই আপনি ইফতারের আগে যেকোনো দোআ করতে পারেন। আপনি নিজের ভাষায় আল্লাহর নিকট আপনার যা যাওয়ার চাইতে পারেন, দোআ পড়তে পারেন,

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخر حسنة وقنا عذب النار -

আপনার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে পারেন। আপনার কল্যাণের জন্য দোআ করতে পারেন। আপনি যখন মনে করেন যদি আপনি এসব চাইতে পারেন তা আল্লাহর নিকট চান। আল্লাহর কাছে আপনি ..... চাইতে পারেন। ইফতারের আগ মুহূর্তের সময় আপনার দোআ করার জন্য সর্বোত্তম সময়।

প্রশ্ন : একজন প্রশ্ন করেছেন যে, সাহরির সময়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোআ আছে কিনা?

উত্তর : যত দূর জানা যায় সেহরীর সময় রাসূল ﷺ কোনো নির্দিষ্ট দোআ পড়তেন তা আমার জানা নেই। এ সম্পর্কে কোনো হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোনো সাহাবীও এমন কোনো দোআ উল্লেখ করেন নি। বস্তুত রাসূল ﷺ যা এনেছেন তা হলো সুন্নাত। তিরমিযীর রোজা অধ্যায়ের ৭৩০ নং হাদীসে এসেছে। যেখানে রাসূল ﷺ বলেন, কেউ যদি সুবহে সাদেকের আগে রোজার নিয়ত না করে তাহলে তার কোনো রোজা নেই।" অর্থাৎ এর অর্থ হলো রোজার জন্য নিয়ত অত্যাবশ্যক। এটা অবশ্যই সুবহে সাদেকের পূর্বে করতে হবে। বা রাতের পরও করা হতে পারে কিংবা সুবহে সাদেকের পূর্বে যেকোনো সময় করা যেতে পারে। কিন্তু আপনার নিয়ত করার জন্য এটা অত্যাবশ্যক নয় যে, আপনি উচ্চৈঃস্বর উচ্চারণ করতে হবে। এটা মনে মনে অন্তরে ইচ্ছে পোষণ করলেই যথেষ্ট হবে। আপনি যখন নামাজ পড়েন তখন নামাজের নিয়ত করলেই হয়। উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে করার দরকার হয় না। একইভাবে রোজা রাখার নিয়ত মনে মনে করলেই হবে। আমি আগামিকালের রোজা রাখবো এটা উচ্চৈস্বরে বলার দরকার নেই। অনেক মুসলমান আছেন যারা আরবিতে বা অন্যান্য ভাষায় বলে থাকে বিভিন্নভাবে যেমন আমি আগামীকাল রোজা রাখবো এমন বলে থাকে, এমন কোনো বর্ণনা কোনো হাদীসে নেই। রাসূল ﷺ বা সাহাবীগণ এমন কোনো বর্ণনা করেছেন, এমন বর্ণনা হাদীসে নেই। 'আমি আগামিকালের রোজা রাখবো' এমন কোনো বর্ণনা সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না।

সুতরাং মনে মনে অন্তরে নিয়ত করলেই হবে। সেহরীর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোআ নেই।

প্রশ্ন : কোনো লোক যদি রোজা রাখার নিয়ত করে ঘুমালো কিন্তু কোনো কারণে যেমন ঘুম থেকে না জাগতে পারার কারণে সেহরী খেতে পারলো না, তাহলে সে কি রোজা রাখবে?

উত্তর : যদি কোনো লোক পরবর্তী দিনের রোজা রাখার নিয়ত করে ঘুমায় এবং সেহরী খাওয়ার নিয়ত করে ঘুমায় এবং সে ঘুম থেকে জাগতে পারলো না বা অন্য কোনো কারণে সেহরী করতে পারলো না, তাহলে তার জন্য সেহরী করাটা যেমন রাসূল ﷺ সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের রোজা/সাওম অধ্যায়ের ১৯২৩ নং হাদীসে

বলেছেন "সেহরীরতে রহমত রয়েছে।" এটা সুন্নত। কিন্তু কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং তার যদি রোজার নিয়ত থাকে রোজা রাখার এবং ঘুম থেকে না উঠতে পারার কারণে সেহরী খেতে পারল না, তাহলে তার নিয়ত কবুল হবে।

প্রশ্ন : ডা. জাকির, রাসূল ﷺ কি সেহরীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট খাবার-দাবারের কথা উল্লেখ করেছেন কী?

উত্তর : এ বিষয়ে সুনানে আবু দাউদের ২য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ২৩৩৮ নং হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, বিশ্বনবীদের জন্য সেহরীর সর্বোত্তম খাদ্য হলো খেজুর। সুতরাং সেহরীর জন্য সর্বোত্তম খাবার হলো খেজুর। মহানবী ﷺ মুসনাদে আহমদ এর ১৭তম খণ্ডে ১১০৮৬ নং হাদীসে আরো বলেন, "তোমরা সেহরী খাও যদিও তা কেবল এক পাত্র পানি হয়।"

তাই বলা যায়, সেহরীর জন্য উত্তম খাদ্য হলো খেজুর, সাথে অন্য খাবার এবং পানি।

প্রশ্ন : রোজার সময় যেসব কাজ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং যেসব কাজ সুন্নতের পরিপন্থী তা উল্লেখ করবেন কি?

উত্তর : রোজার মাসে যে সব কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং সুন্নতের পরিপন্থী তা হলো :

প্রথমত : কেউ কেউ আছেন যারা মুখে রোজার নিয়ত বলেন, কেউ রোজার নিয়ত মুখে বলবে না।

২য় হলো কারো অতিরিক্ত খাওয়া, এটা ইফতার হোক অথবা রাতে অথবা সেহরীতে, তৃতীয় হলো রাগান্বিত হওয়া, ৪র্থ হলো তাড়াতাড়ি এবং দ্রুত তারাবীহ্ নামাজ পড়া। ৫ম হলো ইতিকাফের সময় সমাজে বের হওয়া, সামাজিক কর্মকাণ্ড করা।

প্রশ্ন : রমজান মাসে কোন কোন কাজ নাজায়েয করা হয়েছে?

উত্তর : যে সমস্ত কাজ সাধারণত হারাম, নাজায়েয, বিশেষ করে রোজার সময় নাজায়েয তাহলো– ১. এবং পরনিন্দা, এটা একটা নিকৃষ্ট পাপ। ২. মিথ্যা বলা ও অপ্রয়োজনীয় অশ্লীল কথা বলা। ৩. ঝগড়া বিবাদ করা, গালাগালি করা, ৪. অশ্লীল কথা বলা, ৫. অপবাদ দেওয়া এবং পরচর্চা করা, খোশগল্প করা, ৬. প্রতারণা করা, ৭. অশ্লীল গান এবং বাদ্য শোনা, ৮. টেলিভিশনে অশ্লীল অনুষ্ঠান ও সিনেমা দেখা, ৯ম হলো– অশ্লীল ম্যাগাজিন ও বই পড়া, ১০. অশ্লীল Website browuse করা, ১১. অপচয় করা, ১২. খাদ্য নষ্ট করা।

প্রশ্ন : ডা. জাকির, কেউ যদি তার জবান বা জিহ্বাকে সংযত না করে তাহলে কি রোজা অর্থহীন হবে না?

উত্তর : জিহ্বা সংযত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চাইতে জিহ্বা একজন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন বা উপকার করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। জিহ্বা একজন ব্যক্তির নিজেকে প্রকাশ করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে, রাসুল ﷺ বলেন, তাছাড়া এ বিষয়ে অনেকগুলো সহীহ হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। "মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা" গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬৪৯০ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাসুউদ (রা) হতে বর্ণিত।

তাছাড়া কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুরা 'কাফ' এর ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ـ

অর্থ : সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে (ফেরেস্তা)।

সুরা ইসরা'র ৫৩ নং আয়াতে আরো এসেছে,

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : আমার বান্দাদের কে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে।

এভাবে আল্লাহ জিহ্বার হিফাজতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। রাসুল ﷺ বলেন, সহীহ বুখারীর ৮ম খণ্ডের ৬৪৮৪ নং হাদীসে বলেন, "একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে তার জিহ্বা ও হাত দ্বারা অবশ্যই ক্ষতি করবে না।"

অর্থাৎ একজন মুসলমান অবশ্যই অপর মুসলমানকে তার হাত দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা অবশ্যই ক্ষতি করবে না। সহীহ বুখারীর ৮ম খণ্ডের ৬৪৭৪ নং হাদীসে রাসুল ﷺ আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও তার দুই উরুস্থিত স্থানের জিম্মাদার হলো, আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব।'

সহীহ বুখারীর ৮ম খণ্ডের ৬৪৭৫ নং হাদীস আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন উত্তম কথা বলে আর চুপ থাকে।"

অর্থাৎ আপনি কথা বললে ভালো কথা বলবেন, আর তা নাহলে চুপ থাকবেন। রাসুল ﷺ আরো বলেন, "রোজা ঢালস্বরূপ,

সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড রোজা অধ্যায় হাদীস নং ১৮–৯৪ ও ১৯–০৪।

সুতরাং রোজার সময় আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। রোজা আপনাকে আত্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : রোজা রেখে যদি কেউ তার জিহ্বার হেফাজত না করে তা হলে তার কি পাপ হবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি রোজার মাসে রোজা রেখে মিথ্যা ও অহেতুক অপ্রয়োজনীয় কথা বলে তাহলে তার পরিণাম সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেন, 'কেউ রোজা রেখে খারাপ কাজ ও মিথ্যা বলা ত্যাগ করতে পারলো না, আল্লাহর নিকট তার ক্ষুধা পিপাসা ছাড়া আর কিছুই দরকার নেই।'

সহীহ বুখারী ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৯০৩।

অর্থাৎ রোজা রেখে যদি কেউ মিথ্যা বলা, খারাপ কাজ, গালি দেওয়া এসব থেকে বিরত না হতে পারলে তাহলে আল্লাহর নিকট তার এ খাওয়ার কষ্ট, ক্ষুধা-পিপাসা, কষ্ট ভোগ করার প্রয়োজন নেই।

এটা নির্দেশ করে যে, এসব কাজে আর রোজা ভঙ্গ হবে না ঠিকই কিন্তু রোজার যে প্রতিদান পাওয়ার তা নষ্ট হয়ে যাবে। সে রোজার কোনো সওয়াব পাবে না।

যদি কেউ রোজা রেখে বিভিন্ন নাজায়েয যেমন মিথ্যা বলা অব্যাহত রাখে, তাহলে স্বভাবতই রোজার সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হবে, যা তার রোজা কবুল হবে না। যেমনটি রাসুল ﷺ বলেন, "অনেক লোক আছে রোজা রাখে কিন্তু তারা ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট ছাড়া কিছুই প্রতিদান পায় না।" সুনানে ইবনে মাজা খণ্ড ৩, রোজা---হাদীস-১৬৯০ এর অর্থ হলো, রোজা রেখে খারাপ কাজ, মিথ্যা বলা, অশ্লীল কথা বলা অব্যাহত রাখলে রোজা রেখে ক্ষুধা, পিপাসার কাজ ছাড়া তার জন্য কোনো উপকার হওয়ার নেই, রোজার আসল উদ্দেশ্য, রোজার শিক্ষা কিছুই অর্জিত হবে না।

প্রশ্ন : রোজার মাসে গীবত ও পরনিন্দার পরিণাম কী?

উত্তর : ইসলামের অন্যতম পাপ হলো গীবত তথা পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করা। যেমন মহান আল্লাহ কুরআনের সুরা 'হুমাজায়' প্রথম আয়াতে বলেন, "প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

অর্থাৎ আল্লাহ গীবত ও পরনিন্দাকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ সূরা হুযরাতের ১২ নং আয়াতে আরো বলেন,

يَـاَيُّهَا الَّذِيْـنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِـبُوْا كَثِـيْرًا مِّـنَ الظَّنِّ ـ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَتَجَسَّـسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ـ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : "মুসলিমগণ, তোমরা বেশি বেশি ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয়ই কত ধারণা গুনাহ এবং গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?'

আল্লাহ পরনিন্দাকে ঘৃণা চরম অপদার্থ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এর জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করতে অসাধারণ উদাহরণের অবতারণা করেছেন। প্রথমে বলেছেন, তোমরা কি তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে রাজি হবে? প্রথমত ভাইয়ের মাংস খাওয়া হারাম। তাছাড়া মৃত ভাইয়ের মাংস তা আরো অনেক বড় পাপ। সুতরাং পরনিন্দা বা গীবত দ্বিগুণ পাপ, এটা অনেক বড় গুনাহ। হাদীসে এসেছে , একদিন রাসূল (স) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, গীবত কী? তারা জবাবে বললো, এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি কোনো লোক অন্য কারো অনুপস্থিতিতে কিছু বললো যা তার সামনে বললে সে অসন্তুষ্ট হতো তাহলে এমন কিছু বলা গীবত।

সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড হাদীস, ৬২৬৫।

অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে কোনো কিছু বলাই গীবত।

কারো পেছনে বা অনুপস্থিতিতে কোনো সত্য নিন্দার বিষয় বলাটাও গীবত। তাই বলা হয়েছে, গীবত একটি জঘন্য পাপ। অন্য একটি সহীহ হাদীস, যা সুনানে আবু দাউদ-এর ৩য় খণ্ডের ৪৮৫৭ নং হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত সাফিয়া সম্পর্কে রাসূল (সা.) কে কিছু বলছিলেন। তখন রাসূল ﷺ সাথে সাথে তাকে বললেন, তুমি কী বলছো, যদি তুমি ... একটি শব্দও ....।

সুনানে আবু দাউদের ৩য় খণ্ডের ৪৮৬০ নং হাদীসে আরো এসেছে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমাকে যখন

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি দেখলাম কিছু লোকের জিহ্বা তাদের পিঠের সাথে আটকানো রয়েছে। তখন অনেক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন তারা কে? তখন রাসূল (সা.) বললেন, তারা ঐসব লোক যারা পরনিন্দা করতো।'

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, গীবত কত বড় পাপ। এই পাপ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। অনেকে সজ্ঞানেই এ পাপ করে থাকে, তারা জানে না যে, এটা কত বড় পাপ। তাদের এ সম্পর্কে জানতে হবে।

রাসূল (সা.) সহীহ্ বুখারীর ৮ম খণ্ডের ৬০৫৬ নং হাদীসে বলেন, 'যে গীবত করবে সে জান্নাতে যাবে না।'

এসব হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম গীবত ও পরনিন্দা কত বড় পাপ। এসব থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন : রোজার মাসে আরো কী কী কাজ আছে যা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে?

উত্তর : আরো যেসব কাজ যা করতে রমজান মাসে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে তাহলো : ১. অনেক লোক আছে যারা সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায় রাত জেগে থাকার কারণে এবং রাত জেগে নামাজ পড়ার কারণে।

২. অনেকে আছে যারা অলস, রোজার মাসে দিনের বেলা।

৩. অনেক লোক আছে যারা আনন্দ, ফুর্তি, খেলা, গল্প করে দিনের বেলার সময় নষ্ট করে। তারা আরো অনেক কাজ করে যা রাসূলের সুন্নত বিরোধী।

৪. ইফতার পার্টির আয়োজন করা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয় বরং দেখানোর জন্য।

৫. অনেক বাড়ির মহিলাদেরকে সেহরী ও ইফতারীর অনেক বেশি বেশি খাবার আয়োজন করতে বলে আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে যাতে করে ঐসব মহিলাদের অধিকাংশ সময় রান্না ঘরে ব্যস্ত থাকতে হয়।

৬. অনেকে আছেন যারা দিনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে ঈদের জন্য ঘর সাজাতে ব্যস্ত থাকে।

৭. অনেক লোক আছেন যারা সাধারণত নিজেদেরকে আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য অপ্রয়োজনীয় অনুৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত রাখে।

৮. অনেকে আছে যারা বাজে কাজে সময় ব্যয় করে।

৯. অনেক লোক আছেন যারা রাত্রের অধিকাংশ সময় কাটায়।

১০. রাত্রের বেশিরভাগ সময় খাওয়া-দাওয়াতে অতিবাহিত করা, ১১তম হলো– তাদের অনেক আছে যারা সময় অতিবাহিত করে lotrinng and raning about আল্লাহর ইবাদত ছাড়া।

১২. অনেকে আছেন যারা রোজার শেষ ১০ দিন আল্লাহর ইবাদতের চেয়ে ঈদের জন্য কেনাকাটায় বেশি ব্যস্ত থাকে।

প্রশ্ন : ডা. জাকির, রমজান মাসে ইসলামি তথা দ্বীনি ইলম অর্জনে শিক্ষার প্রতি কেন এতো বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে?

উত্তর : আপনি জানেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশ হলো 'পড়' অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা, এটা অবশ্যই নামাজ নয়, রোজা নয় বা হজ্বও নয়। বরং এটা হলো ইকরা, 'পড়'। যেমন মহান আল্লাহ কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম ও ২য় আয়াতে বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থ : পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"। যিনি মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনে মানুষকে প্রথম যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাহলো 'পড়' এখানে কেবল পড়তে বলা হয় নি বরং বলা হয়েছে 'তোমার প্রভুর নামে পড়' অর্থাৎ পড়া গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সূরা মুজাদালার ১১নং আয়াতে এ সম্পর্কে আরো বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।

আল্লাহ সূরা বাকারার ২৬৯ নং আয়াতে বলেন,

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ـ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ : তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়, উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান।

মহানবী (সা.) আরো বলেন, এটা সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ডের (ইলমে অধ্যায়) ৭১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ যদি কাউকে কল্যাণ দান করতে চান, সাহায্য করতে চান তাহলে তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। সহীহ মুসলিমের ৩য় খণ্ডের ৪০০৬ নং হাদীসে রাসূল (সা.) আরো বলেন, "যখন কোনো লোক মারা যায়, মৃত্যুর পর তার সকল কাজ স্থগিত হয়ে যায়, কেবল তিনটি জিনিস অব্যাহত থাকে। তাহলো : সে যদি জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যদের জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং যে ব্যক্তি সৎ সন্তান রেখে যায়, যারা তার জন্য দোআ করতে থাকে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার সকল ভালো কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ বন্ধ হয় না, তার প্রথমটি হলো সদকায়ে জারিয়া। সাদকায়ে জারিয়া হলো এমন সৎ কাজ যা প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে এবং সৎ কাজ যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে, দ্বিতীয় হলো অপরকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। আর এই দ্বীনি জ্ঞান অন্যজন শিখে আমল করে এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া তাহলে তা সাদকায়ে জারিয়া হয়ে যায়। শেষটি হলো এমন সন্তান রেখে যায় যারা তাদের পিতা-মাতার জন্য দোআ করতে থাকে। তাই জ্ঞান অতি গুরুতপূর্ণ।

আল্লাহ কুরআনে আরো বলেন, (সূরা নহল আয়াত নং ৪৩)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ ـ

এবং সূরা আম্বিয়ার ৭নং আয়াত,

অর্থ : আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশ সহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমাদের জানা থাকে, যদি জানা না থাকে এবং আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব যদি তোমরা না জানো তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সেই বেশি গ্রহণযোগ্য যে জ্ঞানী এবং জ্ঞানী লোকের জন্য এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার সুযোগ অবশ্যই বেশি এবং আখিরাতে বেশি মর্যাদা পাওয়ার। এ কারণে রমজান মাসে জ্ঞান অর্জন করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবে সে বেশি মর্যাদা ও বেশি সওয়াব পাওয়ার যোগ্য হবে।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন হলো– গান বাজনা সম্পর্কে অনেক মুসলমান বলেন যে, গান বৈধ, আপনি কি রাসূল (স.)-এর কোনো বক্তব্য পেশ করবেন না Music নিষেধ করে?

উত্তর : মুসলিম আলেমদের মধ্যে অধিকাংশ একমত পোষণ করে যে, Music ইসলামে অনুমোদিত বা বৈধ নয়, কিন্তু Music নিষিদ্ধ করা বিষয়ে কুরআনে সরাসরি কোনো আয়াত পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা আছে। যেমন আল্লাহ সূরা লুকমান-এর ৬নং আয়াতে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ـ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ

অর্থ : "একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অনর্থক কথা হলো যা কোনো জ্ঞানের কথা বলে না, কোনো অর্থপূর্ণ কথা না তা আমলে অশ্লীল সঙ্গীত এবং Musical instruments. Music নিষিদ্ধ করার বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর অনেকগুলো সহীহ হাদীস রয়েছে। আপনি যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীস অধ্যয়ন

করেন, তাহলে Music অবৈধতার বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। সহীহ বুখারীর ৭ম খণ্ডের মাদক অধ্যায়ের ৫৫৯০ হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেন, "আমার অনুসারীদের মধ্যে কিছু লোক থাকবে যারা যিনা করবে, যেমন That is aditry and formication রেশমের পোশাক পরার মদ পান করবে এবং খাদ্য বস্ত্র ব্যবহার করবে। বৈধ হিসেবে যখন এ হাদীস বর্ণনা করা হয় তখন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় যা বৈধ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু আপনি জানেন যে, মদ হারাম, যিনা হারাম। কারণ এখানে (Music) ঐ সব বিষয়ের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যা হারাম, বাদ্যযন্ত্র সেসব জিনিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এটা পরিষ্কার যে, রাসূল (সা.) বাদ্যযন্ত্রকে হারাম হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু অনেক লোক এগুলোকে বৈধ করে নিয়েছে। আর আপনি জানেন যে, অনেক কলেজ বা গানবাদ্য করার অনুমতি দেয়, এ হাদীস স্পষ্টভাবে বাদ্যযন্ত্র হারামের বিষয়ে ঘোষণা করে।

অন্য সহীহ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে কিছু বাদ্যযন্ত্র বৈধতার বিষয়ে বর্ণনা এসেছে বিশেষ করে 'দফ' এর সম্পর্কে। সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ডের ৮৭ নং হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন দুই ছোট বালিকা 'দফ' বাজাচ্ছিল এবং গান গাচ্ছিল, তখন হযরত আয়েশার পিতা হযরত আবু বকর (রা) আগমন করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা এটা বন্ধ কর। রাসূল (সা.) তখন আরাম করছিলেন এবং এটা হযরত আবু বকর (রা.) দেখলেন, তিনি আবু বকর (রা.) বললেন, তাদেরকে তা করতে দাও, এ কাজ তো ঈদের দিন।

তিরমিযী শরীফের ৩৬৯০ নং হাদীস রাসূল (সা.) বলেন, একজন লোক... এবং তাকে বললো, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

আপনি যদি বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন তাহলে আমি গাইব এবং 'দফ' বাজাব, যখন রাসূল (সা.) বললেন' যদি তুমি Named তাহলে তুমি এটি কর আর যদি ... তাহলে কর না।'

এ হাদীস নির্দেশ করে যে, বাদ্যযন্ত্র হারাম কিন্তু দফ বৈধ, তাই রাসূল (সা.) কখনো কখনো দফ বাজাতে অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশ্ন : এর আগে আমরা রোজার উদ্দেশ্য আলোচনা করার সময় রোজার আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উপকারিতা আলোচনা করেছিলাম। আপনি কি রোজার অন্য উপকারিতাগুলো আলোচনা করবেন?

উত্তর : ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা ছাড়াও রোজার আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপকারিতাগুলো আমরা আগেই আলোচনা

করেছি। সেসব উপকারিতা ব্যতীত রোজার অন্য যেসব উপকারিতা রয়েছে সেগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। তাহলো রোজার দৈহিক উপকারিতা, মানসিক উপকারিতা এবং রোজার সামাজিক উপকারিতা।

দৈহিক বা শারীরিক উপকারিতা : যেহেতু রোজা রাখতে হলে বান্দাকে অবশ্যই খাওয়া, পান ও যৌন কার্যকলাপ থেকে সুবহে সাদেক হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরত থাকতে হয়, আর শরীরের অন্যতম অংশ হলো পাকস্থলী যা শরীরের অধিকাংশ রোগ-ব্যাধি বহন করে যেমন রাসুল (সা.) "ইবনে মাতা'র ৪র্থ খণ্ডের খাবার অধ্যায়ের ৩৩৪৯ নং হাদীস বলেন, "আদম সন্তানের জন্য এমন সুখকর There is monthing better evils than the stomark it is sufficient for a man to be and his feced with a few muchels, but his to devided is to three party.

পাকস্থলীর তিনটি অংশ আছে, তার একটি অংশ হলো খাদ্যের জন্য, অন্য অংশ হলো পানির জন্য এবং অপর অংশ হলো বায়ুর জন্য।

আপনি যদি জানেন যে, অধিকাংশ রোগ পাকস্থলীতেই সৃষ্টি হয়। কারণ এটা ব্যাকটেরিয়ার আবাসস্থল, আর যে সব খাবার খাওয়া হয় তা সরাসরি পাকস্থলীতেই যায় এবং পাকস্থলী তা হজম ও প্রক্রিয়াজাত করে শরীরের বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করে থাকে। আপনি জানেন যে, পাকস্থলী সারা জীবন বিরামহীনভাবে তার কাজ চালিয়ে যায় এটা কখনোই কোনো বিরতি পায় না। যখন আপনি রোজা রাখেন তখন শরীরের অতি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল এ অঙ্গ দিনে কোনো খাবার গ্রহণ করে না। রোজা রাখলে পাকস্থলীতে কোনো খাবার যায় না তখন এই শরীরের এই অতি সংবেদনশীল অংশ বিরতি পায়। ফলে শরীরের যেসব দূষণ সৃষ্টি হয় তা দূর হয় শরীর শোধিত হয়, তাই রোজা শারীরিকভাবে অনেক উপকারী। রোজা শরীরের জন্য অনেক উপকারী এবং রোজা অনেক রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়, অনেক রোগ নিরাময় করে।

রোজার মানসিক উপকারিতা

রোজার অনেক মানসিক উপকারিতা রয়েছে, রোজা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, ধৈর্যশীল করে তোলে এবং অধ্যবসায়ী করে তোলে।

রোজা ব্যক্তিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্য করে তোলে। তাকে নিয়মানুবর্তী করে তোলে, আত্মসচেতন করে তোলে। রোজা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের বিবেককে

আরো শাণিত করে তুলতে পারে। রোজার মানসিক উপকারিতামূলক ব্যক্তির ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা তথা ধৈর্যশীল করে তোলে এবং অধ্যবসায়ী করে তোলা। রোজা ব্যক্তিকে এমন করে তোলে যে, কোনো ব্যক্তি মনে করে যে, আমি এটা করবো না, সে রোজা পালনের মাধ্যমে চলতে অভ্যস্ত হয়, যে আমি এটা করতে পারবো। অর্থাৎ রোজা আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। রোজা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি সাধন করে থাকে। এটা সার্বিক উন্নতি সাধন করে তোলে। রোজা হলো এক প্রকার সাধনা প্রশিক্ষণ। এটা আচরণকে পরিবর্তন করে থাকে। যদিও আচরণ পরিবর্তন করা একটা কঠিন কাজ। কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কোনো অভ্যাসে অভ্যস্থ হয় তাহলে তা পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। এটাকে বলা যায় মনের সাথে জিহাদ করা। অর্থাৎ নিজের মনের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা। অভ্যাস পরিবর্তন করা অতি কঠিন হলেও রোজা এ অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে পারে। জিহাদে তথা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করা কঠিন, কিন্তু আপনি যদি নিজের সাথে নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে না পারেন তাহলে আপনি কীভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, তাই রোজার (Fsting helps in the dimension)

এ কারণে রোজা জিহাদের আগেই ফরজ করা হয়েছিল। রোজা নবুওয়াতের ১৫তম বছরে ফরজ করা হয়। এটা হিজরী ২য় সনে এবং এর পরের বছর জিহাদকে ফরজ করা হয়। তাই বলা যায়, আল্লাহ মুসলমানদেরকে প্রথমে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলেছেন এ রোজার মাধ্যমেই তারপর তাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করেছেন, যা তাদের জন্য মানসিকভাবে অনেক সাহায্য করেছে। সাধারণত আমরা দিনে তিনবার খাবার খাই। কিন্তু রোজা আমাদের খাওয়ার এ অভ্যাসকে পরিবর্তন করে দেয়, আমরা দুবার খেতে অভ্যস্ত হই আমরা প্রথম রাতে একবার খাই এবং শেষ রাতে একবার খাই। আমাদের সারা বছরের খাওয়ার অভ্যাসটা পুরোটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবে রোজা আমাদেরকে দৈহিকভাবে পরিবর্তন করে তোলে, এটা আমাদের ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

রোজার সামাজিক উপকারিতা

রোজার সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে অন্যতম হলো মানুষ বিশেষ করে ধনীরা গরীবদের দুঃখ কষ্ট অনুধাবন করার সুযোগ পায়, গরীবদের অভাব, খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে। তাছাড়া রোজা রাখলে

ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করা যায়। আমাদের অনেকে আছে যারা ধনী, তারা কখনো ক্ষুধার কষ্ট বোঝে না, রোজার মাধ্যমে তারা ক্ষুধার কষ্ট বুঝতে পারে। এভাবে আমাদের মাঝে গরীবদের ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য বুঝতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছেন সে জন্য কতটুকু তার শুকরিয়া আদায় করছি, কত সময় তার জন্য ব্যয় করছি। তিনি আমাদের যে খাদ্য পানীয় ফলমূল দান করেছেন তার জন্য কতটুকু ব্যয় করছি, আমরা যে বাতাস নিঃশ্বাস নিচ্ছি তার জন্য কতটুকু শুকরিয়া আদায় করছি তা বুঝতে পারি। ধনীরা খুবই এসব বিষয় চিন্তা করে, ভাবতে পারে কিন্তু রোজা তাদেরকে এ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে, তাদেরকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। রোজা তাদেরকে গরীবদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে তাদের প্রতি দয়াপ্রবণ হতে সাহায্য করে। তাদেরকে অন্য মানুষের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে শরীক হতে সাহায্য করে, অপরের দুঃখে কষ্টে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করে। রোজা অন্যের দোষ অপরাধ ক্ষমা করতে শেখায়। এভাবে রোজা সামাজিকভাবে অনেক উপায়ে উপকার করে থাকে। রাসূল (স.) একটি হাদীসে বলেছেন, (সহীহ আল জামে ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৯৬)

যদি তোমরা দুনিয়ায় অপরের প্রতি দয়াশীল হও তাহলে জানাতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ কেউ যদি অন্যের প্রতি দয়াশীল হয় তাহলে আল্লাহ ও তার প্রতি দয়াশীল হবেন।"

তাই রোজা আমাদের সমাজকে আরো সুন্দরভাবে গড়তে সাহায্য করে, অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে।

রোজা মানুষ উদার হতে শেখায়, অন্যকে ভালবাসতে শেখায়, অন্যের প্রতি আরো দায়িত্বশীল হতে শেখায়। রোজা কেবল গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল, দায়িত্বশীল করে তোলে না বরং রোজা পুরো মানব সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। রোজা পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে সাহায্য করে, আপনি বোঝেন যে, আপনার অনেক সময় যথেষ্ট সুযোগ হয় না পরিবারকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে, রোজা কমপক্ষে দিনে দুবার পরিবারের সবাইকে একত্র করে, একবার হলো পরিবারের সবাই সাহরি করে, অন্যটি হলো ইফতারের সময় পরিবারের সকলেই একত্রে ইফতার করে, এভাবে রোজা কমপক্ষে দিনে দুবার পরিবারের সবাইকে একত্র করে, রোজা পারিবারিক সম্পর্ককে গভীর, দৃঢ়

করে, পিতা-মাতার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক গভীর করে বিশেষ করে যে বিষয়গুলো পশ্চিমা বিশ্বে অবহেলা করা হয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে রোজা সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি করে। অনেক সময় আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে বন্ধুদেরকে ইফতারীতে শরীক করে থাকি যা আমাদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন বৃদ্ধি করে। রাসূল (সা.) একটি সহীহ্ হাদীসে বলেন, মুসলিম শরীফ ৩য় খণ্ড, সালাম অধ্যায়, হাদীস নং ৫৩৭৯, রাসূল (সা.) বলেন, "যখন তোমাকে কেউ দাওয়াত করে তখন তুমি তা উপেক্ষা করো না।"

রমজান মাস মুসল্লীগণ ইফতারের সময় একে অপরকে দাওয়াত করে যা পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, বিশেষ করে প্রতিবেশীদের মধ্যে। সমাজের মধ্যে রোজা আত্ম উন্নয়ন, ইসলাহ্ এবং দাওয়াতী কাজের জন্য খুবই উপযোগী সময়। অনেক লোক আছেন যারা নিয়মিত মসজিদে যান না তারা রমজান মাসে নিয়মিত মসজিদে আসেন, তারাবীহ্ নামাজের জন্য আসেন, এ সময় ইসলামের উত্তম সময়, রমজান মাসে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার উত্তম সময়। রোজার মাসে তারাবীহ্র সময়, ইফতারের সময় অন্যের সাথে সাক্ষাত হয় তখন ইসলাহের উত্তম সময়।

এ সময়ে অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। কেননা রমজান মাস মনের পরিবর্তন হওয়ার সময়, রমজানে আল্লাহ্ হেদায়াত দিতে পারেন। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যারা অন্যের প্রতি দয়া দেখায়।"

সূনানে তিরমিযী, হাদীস ঃ ১৯২৪

রাসূল (সা.) আরো বলেন, 'তুমি যদি দয়াশীল হও তাহলে তোমাকেও দয়া করা হবে, তিনি আরো বলেন, তুমি যদি ' তোমার প্রতি কেউ দয়া না দেখালেও তুমি তার প্রতি দয়া দেখাও।'

তাই রোজা সমাজ নির্মাণ এবং জনগণের সম্পর্কের উন্নতিতে এভাবে সাহায্য করে।

রোজার সময় অনুমোদিত কার্যাবলি

প্রশ্ন : ডা. জাকির, রোজা অবস্থায় মহিলারা কী খাবার জিহ্বয় দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যে রান্না করে হোক মহিলা কিংবা পুরুষ তার সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশনা হলো, সহীহ আল বুখারীর ৩য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ২৫ নং হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "খাবারের কোনো অংশ জিহ্বায় দিয়ে দেখলে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না।"

হাদীসটি সহীহ বুখারীর মুতাল্লাক। হাদীসের কিন্তু এই হাদীসটি বায়হাকী, সহীহ ইবনে শায়বা ও অন্যান্য হাদীসে এটাকে সহীহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, ভিনেগার খাবার চেখে বা খাবারে লবণ ও স্বাদ চেখে দেখা রোজার জন্য উত্তম" এ হাদীস প্রমাণ করে যে, খাবারের লবণ স্বাদ চেখে দেখা বৈধ কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন খাবার গলার মধ্যে প্রবেশ না করে এবং সে খাবার গিলে না ফেলে। ইবনে আব্বাস আরো বলেন, এটা কেবল প্রয়োজন হলেই বৈধ। অন্যথায় করা যাবে না। যেমন ইমাম ইবনে হাম্বল প্রয়োজন না হলে খাবার চেখে দেখাকে মাকরূহ বলেছেন। ইবনে তাইমিয়াও অপ্রয়োজনে খাবার চেখে দেখাকে মাকরূহ বলেছেন। যদি কোনো রাঁধুনী মনে করে যে, খাবারের লবণাক্ততা বা মিষ্টতা চেখে দেখা দরকার তাহলে সে সামান্য পরিমাণ খাবার তার জিহ্বার উপর দিয়ে টেস্ট করবে এবং করা যাবে। সাথে সাথে তা ফেলে দিবে। অবশ্যই তা গিলবে না। এটাতে তার রোজা ভাঙবে না। এমন যদি হয় যে, কোনো মা তার সন্তানকে খাবার খাওয়ানোর সময় তার সন্তানের খাবার চিবিয়ে না দিলে সন্তান খেতে পারে না তাহলে ঐ মা খাবার চিবিয়ে দিতে পারবে কিন্তু অবশ্যই তাকে খাবার গিলে ফেলা চলবে না। এটাতে তার রোজা ভাঙবে না। প্রয়োজনে খাবার জিহ্বায় দিয়ে স্বাদ চেখে দেখা বৈধ, কিন্তু অপ্রয়োজনে যেমন ক্ষুধার কারণে কিংবা এমনিতেই স্বাদ নেওয়ার জন্য চেখে দেখা মাকরূহ।

তার মানে হলো রোজা ভঙ্গ হবে না, কিন্তু এমনটা করা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে খাবার চেখে দেখা জায়েয, তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন গিলে ফেলা না হয়।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্নটি অ্যালকোহল প্রয়োগ সম্পর্কিত। চোখে সুরমা দেওয়া সম্পর্কে আমরা জানি যে, চোখে সুরমা দেওয়া সুন্নাত। রোজার সময় সুরমা ব্যবহার করা কি জায়েয?

উত্তর : অ্যালকোহল যা আমাদের উপমহাদেশে সুরমা হিসেবে পরিচিত, চোখে দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (সা.) এটি ব্যবহার করতেন। আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি, সুনানে আবু দাউদ ১ম ২য় খণ্ডের রোজা অধ্যায়ের ২৩৭২ নং হাদীস। হযরত "আনাস (রা) রাসূলের খাবার তৈরি করতেন। তিনি সুরমা ব্যবহার করতেন কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁকে নিষেধ করেন নি। তিনি রোজা অবস্থায়ই নিষেধ করেন নি।"

রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা জায়েয। এটা রোজা ভঙ্গ করে না।

এমনকি কেউ চোখের ড্রপ, কানের ড্রপ ব্যবহার করার পর তার স্বাদ গলায় পৌঁছার পরও রোজার ক্ষতি করবে না। নাক, কান, গলার সাথে জড়িত ডাক্তারগণ যদি আপনাকে এসব ড্রপ দেয়, যা ব্যবহার করার কোনো পর্যায়ে আপনি তার স্বাদ বুঝতে পারেন, তাহলেও রোজা ভঙ্গ হবে না। অনেক ফকীহগণ বলেন যে, এগুলো খাবারের কোন স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে না। এগুলো কোনো স্বাভাবিক খাবার নয়। যদিও এগুলো ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট সময় পর তা গলায় পৌঁছে এবং এর স্বাদ অনুভব হয় যে, তবুও তা রোজা ভঙ্গ করবে না। অপর কিছু কিছু ফকীহ্ মনে করেন যে, যদি তা গলায় পৌঁছে যায় তাহলে তা রোজা ভঙ্গ করবে। যেহেতু এগুলো খাবারের কোনো স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে না তাই এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না। এ মত অধিকাংশ ফকীহ্ সমর্থন করেন। নাকের ড্রপের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এটা ইফতারের পর ব্যবহার করা উত্তম। অতি জরুরি হলে তা গলায় পৌঁছার পর ফেলে দিতে হবে। কান ও চোখের ড্রপের কারণে রোজা ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন : আতর বা পারফিউম ব্যবহার করা (রোজা অবস্থায়) কি জায়েয?

উত্তর : আতর ব্যবহার করা, বিশেষ করে কাপড়ে পারফিউম ব্যবহার করা এবং তার সুগন্ধ নেওয়া জায়েয। পারফিউম যদি ধোয়ার সাথে না হয় কেবল কাপড়ে বা শরীরে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা জায়েয। পারফিউম যা ধোয়ার মাধ্যমে ছড়ায়, যা পেটের মধ্যে বা নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এমনটি না হলে তা জায়েয। আতর, পারফিউম ব্যবহার করা, তার সুগন্ধ নিলে রোজা ভঙ্গ করবে না।

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া কি জায়েয?

উত্তর : অনেক প্রকার ইনজেকশন রয়েছে, যেমন ইন্‌টারভেনিস ইনজেকশন, ইন্টারমাসকুলেন ইনজেকশন, সাব কুইটেন ইনজেকশন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, ইনজেকশন দুই প্রকার। এক প্রকার ইনজেকশন হলো– যা কোন লোককে স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করে থাকে, যা মূলত খাবার গ্রহণ করার সমতুল্য। উদাহরণস্বরূপ, গ্লুকোজ ইনজেকশন নেওয়া। কোনো লোক অতিরিক্ত ডিহাইড্রেশনে ভুগলে কিংবা মুখ দিয়ে খাবার গ্রহণ না করতে পারলে স্বাভাবিকভাবে তার জন্য মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হলো গ্লুকোজ নেওয়া।

এটা স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য, এ ধরনের ইনজেকশন নেওয়া খাবার গ্রহণ করার মত, তাই এতে রোজা ভেঙ্গে যাবে। যদি ইনজেকশন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য না হয়ে কেবল চিকিৎসার জন্য হয় যেমন ইনসুলিন ইনজেকশন বা পেনিসিলিন ইনজেকশন হয় তাহলে এতে রোজা ভঙ্গ হবে না। এ ধরনের যে সকল ইনজেকশন কেবল চিকিৎসার জন্য এবং যা খাদ্যের পরিপূরক নয় তা রোজা অবস্থায় দিনের বেলা গ্রহণ করলে রোজা ভঙ্গ হবে না, অধিকাংশ ফিকাহবিদ যদিও একে মাকরূহ বলেছেন এবং ইফতারের পর ইনজেকশন নেওয়া পছন্দনীয় বলেছেন, কিন্তু এগুলো গ্রহণ করলে রোজা ভঙ্গ হবে না, কারণ এগুলো কোনো স্বাভাবিক খাবারের মতো নয় বা খাদ্যের কাজ করে না।

প্রশ্ন : মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে, নাকের ড্রপ, জিহ্বাতে কোনো ওষুধ ব্যবহার করা বা বিভিন্ন প্রকার, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কি রোজা অবস্থায় জায়েয হবে।

উত্তর : অনেক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে এবং অনেক প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষাও রয়েছে, যা তালিকা করলে বিশাল বড় হবে। কোনো কোনো ট্যাবলেট আছে যেগুলো স্বাভাবিকভাবে ননিজায়েলার জন্য গ্রহণ করা হয়, এগুলো সাধারণত ২টি প্রবলেমের মতো রোগের জন্য গ্রহণ করা হয়। এমন ধরনের ট্যাবলেট কেবল জিহ্বাতে ব্যবহার করা হয় এবং যা গিলে ফেলা হয় না, কেবল শরীর চুষে নেয় এবং যা শরীরের খাদ্যের কাজ করে না এমন ধরনের ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করলে রোজা ভঙ্গ হয় না। তবে এ ধরনের ট্যাবলেট অবশ্যই গিলে ফেলা যাবে না। শরীর কেবল তা চুষে নিবে। নাকের ড্রপের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো– নাকের ড্রপ যদি গলার

মধ্য দিয়ে পেটে না যায় তাহলে তাও জায়েয, কানের ড্রপ এবং ইনজেকশন ও জায়েয যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো– পরীক্ষার জন্য শরীরে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রবেশ করানো জায়েয। যেমন আঙ্গুল প্রবেশ করানো, যদি পরীক্ষার জন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট জরায়ুর মধ্যে কোনো যন্ত্র প্রবেশ করানো বা অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন I. U.D প্রবেশ করান বা ক্যাথেটা, ওরামকোপ এসবই জায়েয, এমনকি আপনি যদি Uniatral-এ কোন বস্তু যেমন ক্যাথেটা ইত্যাদি পরীক্ষা ও চিকিৎসায় জন্য প্রবেশ করান, তাহলে তা রোজা ভঙ্গ করবে না। একইভাবে যে সব ইনজেকশন যা খাবারের পরিপূরক হিসেবে নেওয়া হয় না, কেবল চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয় তা জায়েয। যদি খাবারের পরিপূরক হিসেবে কোনো ইনজেকশন নেওয়া হয় তাহলে তাতে রোজা ভেঙ্গে যাবে। পরীক্ষার জন্য শরীর থেকে রক্ত নিলেও রোজা ভাঙবে না।

একইভাবে চিকিৎসার জন্য কোনো মলম, লোশন, ক্রিম ইত্যাদি শরীরের ব্যবহার করা জায়েয। এটা রোজা ভাঙবে না। আপনি যদি অন্য চিকিৎসা যেমন ল্যাপসোসপি যা শরীরের পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় তা জায়েয। গামটোসকপি যা পাকস্থলীর পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং তা যদি পেটে কোনো খাবার প্রবেশ না করায় তাহলে তা জায়েয, আবার কোনো যন্ত্র স্পাইনাল কর্ড ও ব্রেনের পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় তাও জায়েয, আবার যদি এনিমা করা হয় তাও জায়েয, এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, মুখ ও নাক দিয়ে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও খাদ্যের চাহিদা পূরণ ব্যতীত শরীরের অন্য অংশ দিয়ে কোনো যন্ত্র শরীরের অভ্যন্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রবেশ করালে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র তো মলদ্বার, যোনি, জরায়ু, দিয়ে প্রবেশ করালে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ এ দ্বারা শরীরে কোনো প্রকার খাবার দেওয়া হয় না এবং এগুলো শরীরে খাবার গ্রহণের কোনো স্বাভাবিক উপায়ও নয়।

প্রশ্ন : রোজার সময় কারো সন্দেহ হলো যে, এটা তার রোজা ভেঙ্গে দিতে পারে, রোজা অবস্থায় সন্দেহ হলে নিয়ম কী?

উত্তর : রোজা অবস্থায় কোন কাজ করা জায়েয অথবা নাজায়েয কারো যদি এমন সন্দেহ হয় বা এ কাজে রোজা ভাঙতে পারে এমন সন্দেহ হয় তাহলে উত্তম হলো সে কাজ থেকে বিরত থাকা, যখন সন্দেহের উদ্রেক হবে তখন সে কাজ থেকে বিরত থাকাটাই ভালো।

আপনার যদি মনে হয় এটা করা আমার জন্য নাজায়েয তাহলে আপনি তা করবেন না, এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নিয়ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআনের সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতে এবং সূরা আম্বিয়ার ৭নং আয়াতে বলেন–

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : যদি তোমরা না জানো, তবে যারা জ্ঞান রাখে তাদেরকে জিজ্ঞাস কর।

যে জ্ঞানী তার নিকট জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই সমাধান দিয়ে দিবেন, এটাই ভালো, আর যদি তা না হয় সন্দেহ হলে তা থেকে বিরত থাকাটাই ভালো।

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে পড়লো যে, তাকে রোজা ভাঙতে বাধ্য করা হলো কিংবা নিয়ম-কানুনের সম্পর্কে না জানার কারণে সে রোজা ভেঙ্গে ফেললো।

উত্তর : এমন পরিস্থিতিতে কি এই ব্যক্তির রোজা ভাঙ্গা জায়েয হবে?

ঐ নিয়ম হলে যা রোজা ভঙ্গ হোক বা না হোক, অথবা এটা কি বৈধ? যদি কোনো ব্যক্তি রোজা অজ্ঞানতাবশত বা ভুল করে রোজা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সেক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হলো– আল্লাহ সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াতে বলেন–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ : যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব। আর তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

অর্থাৎ যদি কেউ বাধ্য হয়ে তা করে কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহভীতি অটুট থাকে তাহলে এক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ হবে। যদি কেউ আপনাকে অবৈধ এমন কিছু করতে বাধ্য করে বা রোজা ভঙ্গ করে তাহলে তার জন্য সে দায়ী হবে না।

এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ আমার উম্মতদেরকে ক্ষমা করবেন, ভুল করলে, ভুলে গেলে এবং জোরপূর্বক করতে বাধ্য করলে।"

সহীহ ইবনে মাজাহর ৩য় খণ্ড হাদীস ২০৪৩ ও ২০৪৫।

অর্থাৎ জোর করে বাধ্য করা ছাড়াও ভুল করলে তা মনে না রাখার কারণেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন।

এ বিষয়ে কুরআনের সুরা আহযাবের ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ اَخْطَاتُمْ بِهِ ـ

অর্থ : এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছেকৃত হলে ভিন্ন কথা

আল্লাহ কুরআনের সুরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে আরো বলেন–

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَانَا ـ

অর্থ : সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।

"যে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাতে আমাদেরকে অপরাধী করো না।"

সুতরাং যে সব কাজ রোজা ভঙ্গের কারণ যেমন : খাওয়া, পান করা, সহবাস করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি কেউ এগুলো বাধ্য হয়ে করে, বা এগুলো করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে দায়ী থাকবে না। আর যদি এমনিতেই করে তাহলে সে তার জন্য দায়ী হবে। দ্বিতীয়ত হলো– যদি এগুলো ভুল করে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কেউ সেহরী খাওয়া শুরু করলো এবং সে ভাবলো সুবহে সাদেক এখনো হয় নি তাই খাওয়া চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু সেটা ভুল, যখনই যে জানতে পারলো তখনই খাওয়া বন্ধ করে দিল, এটা ছিল তার ভুল। তাই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অথবা কেউ ভুলে যাওয়ার কারণে এসব কাজগুলো করে যেমন কেউ ভুলক্রমে ভুলে যাওয়ার কারণে খাওয়া দাওয়া করলো। যেহেতু পরম ক্ষমাশীল তাই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। চতুর্থত যদি কেউ অজ্ঞতার কারণে করলো সে এ সম্পর্কে সচেতন নয়, যেমন কেউ একজন জানে না যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোজা ভেঙ্গে যায়। ফলে যে গলার ভেতর আঙুল দিয়ে বমি করে তাহলে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে ক্ষমা দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

এ চার প্রকার পরিস্থিতিতে, অজ্ঞতার কারণে অনিচ্ছেকৃত ভুল করলে, মনে না থাকার কারণে ভুল করলে তথা ভুলে গেলে এবং কোনো কাজ জবরদস্তির মাধ্যমে করতে বাধ্য হলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। রাসুল ﷺ তার উম্মতের এ চার প্রকার অবস্থায় আল্লাহর ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় কি টুথপেস্ট ব্যবহার করা জায়েয?

উত্তর : অধিকাংশ আলেমের মতে, টুথপেস্ট ব্যবহার করা জায়েয। শায়খ ইবনে আব্বাস (রা), তিনি বলেন, টুথ ব্রাশের সাথে টুথপেস্ট ব্যবহার করা। যেমন : মিসওয়াকের সাথে ব্যবহার করা হয় তেমনি ব্যবহার করা যাবে। রাসুল ﷺ মেসওয়াক ব্যবহার করা নাজায়েয বলেন নি এবং মিসওয়াক ব্যবহারে রোজা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেমন এর কোনো অংশ গিলে ফেলা না হয়। টুথপেস্টের কোনো অংশ গিলে ফেলা নাজায়েয। সতর্ক হয়ে টুথপেস্ট ব্যবহার করা যাবে। অনেক আলেম এর তীব্র স্বাদ ও ঝাঁঝালো গন্ধের কারণে এটা ব্যবহার করা মাকরুহ বলেছেন। টুথপেস্ট ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেছেন। টুথপেস্টের কোনো অংশ গিলে না ফেললে তা রোজা ভাঙবে না, রোজার কোনো ক্ষতি করবে না।

প্রশ্ন : অযু করার পর বা মুখ ধোয়ার পর অনেকে থুথু ফেলতে থাকে। এ বিষয়ে বিধান কী?

উত্তর : অনেক লোক আছেন যারা মুখ ধোয়ার পর, কুলি করার পর বা অযু করার পর থুথু ফেলতে থাকে। তারা মনে করে যে, হয়তো কিছু পানি গলার মধ্যে বসে যাবে। কিন্তু নিয়ম হলো– যে বিষয়ে অধিকাংশ আলেম বা ইমাম একমত পোষণ করেন যে, কুলি করার পর মুখ পরিষ্কার করার পর থুথু ফেলার কোনো দরকার নেই। যদিও কোনো কোনো ইমাম বলেন থুথু ফেলতে ---তা কেবল একবার হলেই হবে। অনেক লোক আছেন যারা বারবার থুথু ফেলেন এমনকি তারা মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে মুছতে থাকেন, তারা ভাবেন যে, পানি পাকস্থলিতে গলে যাবে কিন্তু রাসুল ﷺ-এর জীবনী পড়লে হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসুল ﷺ ও তার সাহাবীগণ সেহরীর সময় আযান পর্যন্ত পানি পান করতেন এবং আযান শোনার সাথে সাথে পানি পান করা বন্ধ করতেন। কিন্তু এমন কোন হাদিস পাওয়া যায় না যে, তারা থুথু ফেলতেন। তারা অনেক সময় ফজর আযান পর্যান্ত পানি পান করতেন। কিন্তু থুথু ফেলার বিষয়ে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। রোজা অবস্থায় অজু করার সময় কুলি করার পর থুথু একবার ফেললেই যথেষ্ট। বারবার ফেলার কোনো দরকার নেই।

প্রশ্ন : যদি কেউ এজমাতে ভোগে তাহলে সে কি অক্সিজেন, ইনহিলার বা অন্য কোনো ট্যাবলেট ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর : কারো যদি এজমা থাকে তাহলে তার জন্য বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা রয়েছে। যেমন, অক্সিজেন, ---ট্যাবলেট ক্যাপসুল, ইত্যাদি। অক্সিজেন, ... যা কেবল ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং এটা ফুসফুসের সঙ্গে আবার বের হয়ে যায় তাই এতে রোজা ভঙ্গ হবে না, কারণ এটা পেটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া অন্য প্রকার চিকিৎসা হলো ডিপ্রেসাইজার করা হয় তা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে তা গাম হতে পারে, তরল হতে পারে। পাটিকেল এই ওষুধগুলো একই পাত্রে ঢুকানো হবে এবং সুইচ চাপলে একপ্রকার প্রেসার তৈরি হয় যা ---সাজানোর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয়। এভাবে এ ওষুধ প্রবেশ করানোর সময় তা পেটে ঢুকে যাওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা থাকে। তাই অধিকাংশ আলেম ডিপ্রেসাইজার ব্যবহার করা রোজা ভঙ্গের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে বলা যায়, ক্যাপসুল একপ্রকার ওষুধ যাতে একপ্রকার পাউডার থাকে। যখন এ ক্যাপসুল পাতে রেখে প্রেসার দেওয়া হয় তখন তা নজেল বা মাস্কের মাধ্যমে ফুসফুসে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এর কিছু অংশ পেটে যাওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা থাকে। তাই ক্যাপসুল ব্যবহার করে চিকিৎসা করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

যে কেউ বা কোনো ব্যক্তি অ্যাজমাতে ভুগলে তার জন্য কেবল দুই প্রকার চিকিৎসা জায়েয। তাহলো অক্সিজেন এবং পারফাম।

প্রশ্ন : রোজার সময় অনুমোদিত ও যেসব কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে সেগুলো কী কী?

উত্তর : সাধারণত রমজান ব্যতীত অন্য সময় যেসব কাজ করা হয় রমজান মাসেও সেসব কাজ করা জায়েয। কেবল যেসব কাজে রোজা ভঙ্গ হয় সেসব কাজ ব্যতীত।

কিন্তু রাসুল ﷺ রমজান মাসে বিশেষ কিছু কাজ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে যে সব কাজগুলো রমজান মাসে আমল করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সে রকম অনেকগুলো কাজের মধ্যে প্রথমেই করা যায় - সেহরী খাওয়া। সেহরী খাওয়া অবশ্যই ত্যাগ করা যাবে না। ২য়

হলো– যতদূর সম্ভব সেহরী দেরীতে খাওয়া, এটা সুবহে সাদেকের পূর্বমুহূর্তে হওয়াই ভালো। ৩য় হলো– যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইফতার করা, ইফতার সূর্যাস্তের পরপরই করা, ৪র্থ হলো, ইফতারিতে খেজুর ও পানি খাওয়া তথা খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার করা, ৫ম হলো– ইফতারের পর রাসুল ﷺ নির্দেশিত দোআ পড়া, ৬ষ্ঠ হলো– ইফতার করার সময় অন্য রোজাদারদের সাথে রাখা, বিশেষ করে গরীব লোকদেরকে ইফতারিতে সাথে রাখা। আরো অন্যান্য যেসব কাজ রাসুল ﷺ করতে বলেছেন তাহলো রমজান মাসে যত বেশি ভালো কাজ করা সম্ভব করতে হবে। ২য় হলো– রমজান মাসে আমাদেরকে যত বেশি সম্ভব উদার হওয়া। ৩য় হলো– কেউ যদি আপনাকে পটানোর চেষ্টা করে তাহলে সেক্ষেত্রে না রেগে যাওয়া বরং বলতে হবে আমি রোজাদার, আমি রোজাদার। ৪র্থ হলো– মেসওয়কে ব্যবহার করা, ৫ম হলো– যদি সম্ভব হয় তাহলে রমজান মাসে ওমরা পালন করা ৬ষ্ঠ হলো– যত বেশি সম্ভব ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা, তাফসীরসহ কুরআন অধ্যায়ন করা, হাদীস পড়া এবং অন্যান্য ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা, ৭ম হলো– যত বেশি সম্ভব ইসলামি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা, যেমন সেমিনার– যেখান থেকে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা যায়, ৮ম হলো– ইসলামি বিভিন্ন প্রকার ইসলামি অনুষ্ঠান দেখা বা শুনা যেতে পারে তা হতে পারে ভিডিও অর্থাৎ যা আপনার ইসলামি জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। ৯ম হলো আপনাকে সর্বদা হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে। মনমরা হয়ে থাকা যাবে না। ১০ম হলো– অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করা। ১১তম হলো– পরিবারের সাথে ভালো আচরণ করা এবং বেশি সময় দেওয়া। ১২তম হলো– বেশি বেশি চিন্তা করা, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা। ১৩তম হলো– অন্যের ভুল অন্যায় ক্ষমা করে দেওয়া, অন্যের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখা।

আরো যেসব কাজ করতে রাসুল ﷺ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তাহলো– ১ম ফরজ নামাজগুলো মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করা, ২য় হলো– যত বেশি সম্ভব সুন্নত ও নফল নামাজ পড়া। ৩য় হলো– যত বেশি সম্ভব আল্লাহর কাছে দোআ করা, ৪র্থ হলো– আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, কারণ রমজান হলো– ক্ষমার মাস, ৫ম হলো– যত বেশি সম্ভব কুরআন তেলাওয়াত করা। ৬ষ্ঠ হলো– তারাবীহ নামাজ আদায় করা।৭ম হলো– বেশি বেশি নামাজ পড়া, বিশেষ করে রাতের শেষভাগে (তাহাজ্জুদ) নামাজ আদায় করা। ৮ম হলো– ইতিকাফ করা। ৯ম হলো– যাকাত দেওয়া, যদি যাকাত ফরজ হয়। ১০ম হলো যথাসম্ভব আত্মউন্নয়ন করা, ১১তম হলো– লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করা, ১২তম হলো– অন্যান্য মুসলিমদের

সাথে দাওয়াতী কাজ করা, তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা, ১৩তম হলো–অমুসলিমদের সাথে দাওয়াতি কাজ করা।

প্রশ্ন : একজন লোক উদারতা মহত্ত্ব কিভাবে বুঝবে? উদারতা বলতে কী বুঝায়? একজন মুসলমান রমজান মাসে উদারতার জন্য কী কী কাজ করবে?

উত্তর : একজন লোক সবসময়ই উদার হবে। বিশেষ করে রমজান মাসে সে তার কথায় ও কাজে আরো বেশি উদার, মহৎ হবে। একজন ব্যক্তির জন্য মহৎ হওয়ার অনেক উপায় আছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ মনে করলো অন্যকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা মহত্ত্ব, উদারতা। কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করা একমাত্র মহৎ কাজ নয় বরং এটা হলো অসংখ্য মহত কাজের মধ্যে একটি মাত্র মহৎ কাজ। আরো যেসব মহৎ কাজ আছে তার মধ্যে অন্যকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, অন্যের সংশোধন করা, দাওয়াতি কাজ করা, অমুসলিমদের সাথে দাওয়াতি কাজ করা, অন্যকে শিক্ষা দেওয়াও মহৎ কাজ। অন্যদের কায়িক শ্রম দিয়ে সাহায্য করাও মহৎ কাজ। অন্যকে কোনো কাজে সহযোগিতা করাও মহৎ কাজ।

যেকোনো ভাল কাজই মহৎ কাজ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এমন একটি অবস্থানে আছেন বা এমন একটি চাকরি করছেন সেখান থেকে অন্যকে সাহায্য করতে পারেন। অন্যের অভাব পূরণ করতে পারেন অন্যের উপকার করতে পারেন। তাহলে তাও মহৎ কাজ।

বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের ৫নং হাদীসে এসেছে (Book of Revolution) বিজয় অধ্যায়ে মুহাম্মদ ﷺ অন্য মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি উদার ছিলেন, এবং রমজান মাসে তার উদারতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতো।

সুনানে তিরমিযীর তাফসীর অধ্যায়ের ৩২৩৩ নং হাদীসে এসেছে, রাসুল ﷺ বলেন, জান্নাতে কতগুলো কক্ষ থাকবে সেখান থেকে বাইরের সব দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সব দেখা যাবে। এসব কক্ষগুলো তাদের জন্য তৈরি করা হবে যারা উদার, মহৎ এবং যারা গরীবদের সাহায্য করে, যারা নিয়মিত রোজা রাখে এবং যারা রাতে নামাজ পড়ে।

এ বিশেষ কক্ষগুলো এসব লোকদের জন্য জান্নাতে তৈরি করা হবে।

আরো অন্য একটি সহীহ হাদীসে যেটি সুনানে ইবনে 'মাজা'র ৩য় খণ্ডের .. অধ্যায়ের ১৭৪৬ নং হাদীসে বলা হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন, "যদি কেউ কোনো

রোজাদারকে খাওয়ায় তাহলে যে ঐ রোজাদারের সমান খাওয়া পাবে, কিন্তু ঐ রোজাদারের খাওয়া কমবে না। এ হাদীস দ্বারা অন্যকে খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ মহত্ত্বের উদারতা।

প্রশ্ন : ড. জাকির, রোজার মাস হলো ক্ষমার মাস এবং আল্লাহ আমাদেরকে এ মাসে পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল হতে বলেছেন। আপনি কি আরো ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : রমজান মাস হলো ক্ষমার মাস, যেহেতু আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাই আল্লাহও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অপরকে ক্ষমা করার জন্য। এ সম্পর্কে কুরআনে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে। যেমন সুরা আলে ইমরানের ১৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ السَّرَّآءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالعَافِيْنَ عِنِ النَّاسِ ۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

অর্থ : যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগ কে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ এরূপ সদাচারীদের ভালোবাসেন।

সুরা আরাফের ১৯৯ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে–

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۔

অর্থ : "আরো ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে থাক।"

সুরা নুরের ২২নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন, "তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"

সূরা তাগাবুনের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ – وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

অর্থ : "হে মুমিনগণ, তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর। তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহিত করেছেন ক্ষমা করার জন্য। যত বেশি সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করা যায় ততই ভালো। মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহ আমাদেকে ক্ষমা করে দেবেন।

আমরা নবী-রাসুলদের জীবন থেকে এর সুন্দর উদাহরণ পাই। হযরত ইউসুফ (আ) ক্ষমার একটি সুন্দর উদাহরণ পাই। আমরা জানি যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৎ ভাইয়েরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন, পরবর্তীতে তিনি সে দেশের শাসক হন এবং যখন তিনি তার ভাইদেরকে কাছে পান তখন তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সুরা ইউসুফের ৯২ নং আয়াতে বলেন (হযরত ইউসুফ (আ) তার ভাইদের কে বলেন)

قَالَ لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ - يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ - وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ -

অর্থ : বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান।

ইউসুফ (আ) তার সব ভাইকে ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমার সর্বোত্তম উদাহরণ দেখতে পাই মহানবী ﷺ এর জীবনে। মহানবী ﷺ যখন মক্কায় ছিলেন তখন মুশরিকরা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে এবং পরবর্তীতে তার অনেক আত্মীয়রা তার চাচাকে শহীদ করেছে। কিন্তু যখন তিনি মক্কা বিজয় করলেন তখন মক্কায় মুশরিকদের ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহ সুরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌ حَسَنَةٌ -

অর্থ : "তোমাদের জন্যে রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"

আল্লাহ সূরা ফুসসিলাত এর ৩৪ নং আয়াতে বলেন–

وَلَاتَسْتَوِىْ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -

অর্থ : "সমান নয় ভালো ও মন্দ, জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

সূরা শুরা ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ -

অর্থ : যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে।

কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা মানুষকে ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : এবারের প্রশ্ন রাগান্বিত হওয়া সম্পর্কিত।

ডা. জাকির, রমজান মাস হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ করার মাস। রোজার মাসে কোনো রোজাদার রাগান্বিত হওয়ার জন্য কি কোনো অজুহাত দেখাতে পারে? অর্থাৎ রোজাকে তার রাগ হওয়ার অজুহাত হিসেবে দেখাতে পারে কিনা। অর্থাৎ সে বললো, আমি রোজা রাখার কারণে রাগান্বিত।

উত্তর : আসলে রোজা আপনার প্রশ্নের বিপরীত আচরণ করতে পারে বলে একজন প্রকৃত রোজাদার অবশ্যই রেগে যাবে না। কেননা মহান আল্লাহ কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থ : আমি তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করে দিয়েছি, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

অর্থাৎ রোজা হলো তাকওয়া অর্জনের জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য। তাই একজন রোজাদার অবশ্যই রাগান্বিত হবে না। কেউ এমনটা বলতে পারবে না যে, আমি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত। এমনটি বলে সে রাগ করতে পারবে না। রাসুল ﷺ এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের ১৯০৪ নং হাদীসে বলেন, "রোজা হলো তোমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ, তোমরা অবশ্যই ...."।

যদি তোমাকে কেউ রাগান্বিত করে, যদি কেউ তোমাকে উত্তেজিত করে তাহলে তুমি তাকে বলো, আমি রোজাদার, আমি রোজাদার।

বুখারী শরীফের ৩য় খণ্ডের সর্বোত্তম অধ্যায়ের ১৮৯৪ নং হাদীসে আরো এসেছে, রাসুল ﷺ বলেন, যদি তোমাকে কেউ উত্তেজিত করে রাগান্বিত করে, তাহলে তুমি তাকে বলো, আমি রোজাদার, আমি রোজাদার," ---সহীহ মুসলিমে অনেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসুল ﷺ আরো বলেন (বুখারী শরীফ ৮ম খণ্ড, আচরণ অধ্যায় হাদীস নং ৬১১৪)

'বীর সে লোক নয়, যে শক্তি মত্তায় অন্যকে পরাজিত করে। বরং বীর সেই ব্যক্তি যে তার রাগের সময় তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্য কেউ তাকে রাগান্বিত করলে যে তাকে ক্ষমা করে দেয়। রোজা মূলত আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম। তাই রোজা অবস্থায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক। রোজা রাগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম।

প্রশ্ন : ডা. জাকির রোজার মাসে ওমরা পালন করা উত্তম বলা হয়েছে। এ বিষয়ে কি কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে?

উত্তর : রমজান মাসে ওমরা পালন করার ফাজিলত অবশ্যই বেশি। কেননা রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবীদের কে রমজান মাসে ওমরা পালন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি সাহাবীদেরকে রমজানে ওমরা পালন করতে বলেছেন। যেমন রাসুল ﷺ সহীহ ৩য় খণ্ডের ওমরা অধ্যায়ের ১৭৮২ নং হাদীসে বলেন, "যদি কেউ রমজান মাসে ওমরা পালন করে তাহলে তা হজ্জের সমান হবে।"

অর্থাৎ রমজান মাসের যেকোনো সময় তা প্রথমে হোক কিংবা শেষে তা হজ্বের সমতুল্য হবে।

প্রশ্ন : ডা. জাকির অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, রোজা অবস্থায় মেসওয়াক করা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে (মাকরূহ) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন?

উত্তর : অনেক লোক আছে যারা ফরজের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বলে মনে করে। তারা হাদীসের ভিত্তিতে ধারণা করে থাকে। যে হাদীস আমি আগেই উল্লেখ করেছি সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের ১৯০৪ নং এবং ১৮৯৪ নং হাদীসে রাসুল ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন, একজন রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশ্‌কের গন্ধের চেয়েও বেশি প্রিয়।"

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে লোকেরা মনে করে যদি মিসওয়াক করলে মুখের দুর্গন্ধ থাকবে না। ফলে আল্লাহ রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ উপভোগ করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, মিসওয়াক করলেও একজন রোজাদারের মুখে যে গন্ধ সৃষ্টি হয় তা বন্ধ হবে না। সাধারণত আমরা যখন মিসওয়াক করি তখন আমাদের দাঁত মাড়ি ইত্যাদি পরিষ্কার হয়, মুখের মধ্যে খাওয়ার পর যেসব খাদ্য কণা জমে তা পরিষ্কার হয়। কিন্তু রোজা রাখলে মুখে যে গন্ধ হয় তা আসলে পেট, পাকস্থলী থেকে আসে, রোজা রাখার কারণে পেট খালি হয়ে যায় ফলে খালি পেট মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। সুতরাং মিসওয়াক ব্যবহার করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। রাসুল ﷺ সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ডের জুম্মা অধ্যায়ের ৮৮৭ নং হাদীসে বলেন; এটা যদি আমার উম্মতের জন্য অতি কঠিন না হতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামাজের পূর্বে তাদের জন্য মেসওয়াক করা ফরজ করে দিতাম।”

অর্থাৎ এটা একটা নির্দেশ, অত্যাবশ্যক কাজ। এটা যদি রোজার জন্য ক্ষতিকর হতো তাহলে তা বলা হতো, যেমন অন্য হাদীসে রোজার ---বেশি পানি ব্যবহার করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, সপ্তম ---অধ্যায় হাদীস নং ২৩৬০। রাসুল ﷺ বলেন, 'নাকে পানি বেশি দাও, গড়গড়া কর, কেবল রোজার সময় ব্যতীত।”

অর্থাৎ গড়গড়া করা বা নাকে পানি বেশি দেওয়া ভালো কিন্তু রোজার সময় এমন কর না, কেননা তা পেটে ---যাওয়ার সম্ভবনা আছে। একইভাবে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করা ক্ষতিকর হলে তিনি বলে দিতেন তোমরা মিসওয়াক কর রোজার সময় ব্যতীত। রোজার সময় মিসওয়াক করা জায়েয। মিসওয়াক করা ---। আপনি এটা আমল করলে ইনশাআল্লাহ সওয়াব পাবেন।

প্রশ্ন : ডা. জাকির কীভাবে একজন ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে জ্ঞান অর্জন করতে পারে?

উত্তর : জ্ঞান অর্জন অবশ্যই উত্তম কাজ, বিশেষ করে রোজার মাসে। বিভিন্নভাবে একজন ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সে কুরআন তিলাওয়াত ছাড়াও কুরআনের তাফসীর পড়তে পারে। সে হাদীস পড়তে পারে। সম্ভব তার সহীহ হাদীস পড়া উচিত, সিহাহ সিত্তার হাদীস পড়া যেতে পারে, বুখারী, মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, ইবনে মাযাহ। এই ছয়টি হাদীস গ্রন্থ ভালো, যদি তার সময় না থাকে তাহলে কমপক্ষে বুখারী ও মুসলিম পড়া অথবা

---অর্থাৎ যে সব হাদীসে একই সাথে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। রাসুলে ﷺ জীবনী গ্রন্থ পড়তে পারে। ইংরেজিতে সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ভালো একটি বই হলো "আর রাহীকুল মাখতুম"। সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান যেমন কোনো লেকচার, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করে সেখান থেকে সে তার ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সে বিভিন্ন প্রকার ইসলামি বই পড়তে পারে। TV-তে বা ভিডিওতে বিভিন্ন প্রকার ইসলামি অনুষ্ঠান দেখতে পারে, ইসলামি অডিও শুনতে পারে। ইন্টারনেটে ভাল ইসলামি ওয়েব সাইট ব্রাউজ করতে পারে। এভাবে রমজান মাসে ইসলামি জ্ঞান অর্জনের জন্য সময় দিতে পারে।

প্রশ্ন : ডা. জাকির , হুসনুস মুলুক দ্বারা কী বুঝায়? এবং "তোমার পরিবারের নিকট ভালো হও" দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : সাধারণত রোজার সময় মানুষ বলে থাকে যে, আমি দুর্বল, অসুস্থ এবং খুব বিরক্তি দেখায়। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ হলো রোজার সময় হাসিখুশি থাকতে হবে। অবশ্যই রোজাদারকে মনমরা থাকা যাবে না। তাকে সবসময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে বিশেষ করে পরিবারের সাথে হাসিখুশি থাকতে হবে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। পরিবারের সাথে বেশি সময় কাটাতে হবে। কেননা তারা যেন আপনার সাথে একত্রে সওয়াব পায়।

হুসনুসখুলুক হলো স্বাভাবিকভাবে অন্য মাসগুলোতে অপর লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। কিন্তু রমজান মাসে অন্যান্য মাসের চেয়ে আরো বেশি ভালো ব্যবহার করা। যেমন বন্ধুবান্ধবের সাথে, প্রতিবেশিদের সাথে আত্মীয় স্বজনদের সাথে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদের সাথে হাসি খুশি থাকা, তাদের জন্য ভালো কিছু করা। অন্যদের দোষ ক্ষমা করে দেওয়া, তাদের সাথে ভালো আচরণ করা ইত্যাদি এবং রমজান মাসে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে বেশি বেশি চিন্তা-গবেষণা করা যেন বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।

রমযানের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. রমযান তাকওয়ার মাস।

২. রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট। (বোখারী ও মুসলিম)

৩. রোযাদারের ইফতার না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করতে থাকে।

৪. রোযাদারের সম্মান বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি বিশেষ দরজা খোলা হবে। ঐ দরজা দিয়ে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বোখারী, মুসলিম ও ইবনে খোযাইমা)

৫. আল্লাহ ঈদ পর্যন্ত প্রতিদিন বেহেশতকে সাজাতে থাকেন এবং বলেন, সহসাই আমার নেককার বান্দারা এখানে প্রবেশ করে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। এই মাস হুরের সাথে রোযাদারের বিয়ের মাস।

৬. এই মাস বড় বড় শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

৭. বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

৮. রমযানের প্রতি রাত্রে রোযাদার মোমিনদেরকে দোজখ থেকে মুক্তি দেয়া হয়। রমযানের শেষ এক রাত্রেই সারা মাসের সমান সংখ্যক লোককে মুক্তি দেয়া হয়।

৯. এই মাসে কদরের রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

১০. এই মাসের প্রথম ১০ দিন রহমত, মাঝের ১০ দিন ক্ষমা এবং শেষ ১০ দিন দোজখ থেকে মুক্তির দিবস।

১১. অন্য মাস যেকোন নেক কাজের বিনিময় ১০ থেকে ৭শ গুণ। কিন্তু রমযানের রোযার প্রতিদান এর চাইতেও অনেক বেশি। আল্লাহ নিজ হাতে সেই সীমা-সংখ্যাহীন পুরস্কার দান করবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

১২. এই মাস দান-সদকার মাস। এই মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাধিক দান করতেন।

১৩. রমযান মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে, তাই এটি কোরআনের মাস।

১৪. রমযান হচ্ছে জেহাদের মাস। এই মাসে মুসলমানদের বড় বড় ঐতিহাসিক বিজয় সাধিত হয়েছে। তাই এটাকে কোরআনের বিজয়ের মাসও বলা হয়।

১৫. এই মাসে এতেকাফ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রমযানে এতেকাফ করতেন।

১৬. ইফতার রমযানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়।

১৭. এই মাসে নফল এবাদত অন্য মাসের ফরযের সমান এবং ১টা ফরয এবাদত অন্য মাসের ৭০ ফরযের সওয়াবের সমান।

১৮. এই মাসের ওমরায় হজ্জের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। (বোখারী, মুসলিম)

১৯. রমযান সবর ও ধৈর্যের মাস।

২০. কোন রোযাদারকে ইফতার করালে রোযাদারের রোযার সমান সওয়াব পাওয়া যায়, যদিও রোযাদারের সওয়াবের কোন ঘাটতি করা হয় না।

২১. শ্রমিক কর্মদিবসের শেষে যেমন পারিশ্রমিক পায়, রোযাদারও তেমনি রমযানের শেষ দিন ক্ষমা লাভ করে। (বায়হাকী)

২২. রমযানের পরের মাসে অর্থাৎ শাওয়ালের ৬ রোযা রাখলে পুরো বছর আল্লাহর কাছে রোযাদার হিসেবে গণ্য হবে এবং রোযার সওয়াব লাভ করবে।

২৩. এই মাসে সেহরী খাওয়া হয়। সেহরীতে রয়েছে অনেক বরকত।

২৪. রমযান রাত্রি জাগরণের মাস। এই মাসে সালাতুল কেয়াম অর্থাৎ তাহাজ্জুদসহ তারাবীর নামায পড়া হয়। তারাবীর নামায দ্বারা অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৫. রমযানে সাদাকাতুল ফিতর দিতে হয়। এর মাধ্যমে রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হয়।

২৬. রোযার মাধ্যমে পেটের যাবতীয় অসুখ এবং ডায়াবেটিসসহ বহু শারীরিক রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়।

২৭. রোযার মাধ্যমে মুখ-চোখ ও কানকে সংযত রাখার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ থেকে নিন্দা-গীবত, অপবাদ ও চোগলখুরীর মতো সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পায়।

২৮. রমযান হচ্ছে তাওবার মাস। তাওবার মাধ্যমে গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২৯. রোযার উপবাসের মাধ্যমে ক্ষুধ-পিপাসায় কাতর অভাবী মানুষের দুঃখ বুঝা সহজ এবং এভাবেই রোযা মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতি, মমত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে।

৩০. ঈদুল ফিতরের খুশি রমযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমরা এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। এর মাধ্যমে যেন আমরা রমযানের মূল শিক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারি। রমযান যেন আমাদের জীবনে গতানুগতিক না হয়ে কল্যাণ ও মুক্তির প্রতীক হতে পারে সে চেষ্টা সবাইকে করতে হবে। আল্লাহ আমাদের জীবনে রমযানকে বারবার ফিরিয়ে আনুন, এটাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

জার্মানীর এক স্বাস্থ্য ক্লিনিকের গেইটে লেখা আছে 'রোযা রাখো, স্বাস্থ্যবান হবে।' এর নিচে লেখা আছে 'মোহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ।' খৃষ্টান জার্মানীসহ অন্যান্য খৃষ্টান চিকিৎসকেরাও রোযার উপকারিতার বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা করেছেন। বিশ্বের অনেক দেশে রোযার মাধ্যমে "চিকিৎসা ক্লিনিক" খোলা হয়েছে। এর মধ্যে বেশি প্রসিদ্ধ হল জার্মানীর ডঃ হেজিগ ব্লাহমার ক্লিনিক, ডঃ ব্রাশরাবজ ও ডঃ ওয়ালারের ক্লিনিক।

রোযা কম খাওয়ার ট্রেনিং। কিন্তু রোযা ছাড়াও ইসলাম কম খাওয়াকে উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ 'পেট ভর্তি করে খাওয়া অপেক্ষা মানুষের জন্য মন্দ দ্বিতীয় কোন কাজ নেই। আদম সন্তানের টিকে থাকার জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট। যদি তা না করে (অর্থাৎ বেশি খেতে চায়) তাহলে পেটের এক তৃতীয় অংশ খাবার, এক তৃতীয় অংশ পানি এবং অপর তৃতীয় অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখা দরকার।' (আহমদ, ইবনে, মাজাহ, হাকেম)

সীরাতে হালাবীয়াতে বর্ণিত, মিসর সম্রাট মুকাউকাস মুসলমানদের চিকিৎসার জন্য এক জন চিকিৎসক পাঠান। নবী ﷺ এই বলে চিকিৎসককে ফেরত পাঠান, (কেউ কেউ বলেন, এটা কোন সাহাবী বা তাবেঈর বক্তব্য) ঃ

'আমরা এমন এক জাতি, যারা ক্ষুধা না লাগলে খাই না, আর খেলেও ক্ষুধা বাকী থাকতে খাওয়া ত্যাগ করি। তাই আমাদর চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই।' এ বর্ণনা থেকে দেখা যায়, বাঁচার জন্য যেমন খাবার দরকার, আবার বেশি খাদ্য রোগের ভাণ্ডার।

মানুষ সাধারণতঃ ১২/১৪ ঘণ্টা খাদ্য থেকে বিরত থাকতে পারে। এতে তেমন কোন কষ্ট ও দুর্বলতা অনুভব করে না। এ সময়টুকু রাতের ঘুমের সমপরিমাণ। রাত্রের ৭/৮ টায় এশার সময় খেলে পরের দিন সকাল ৭/৮ টায় নাস্তা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা সময় না খেয়েই কেটে যায়। রোযার মধ্যে সময় আরো ২/১ ঘণ্টা বেশি যোগ হয় ফলে, সেটা স্বাভাবিক। শরীরে যে পরিমাণ ক্যালরি মওজুদ থাকে তা ১২/১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত যথেষ্ট।

রোযা রাখলে এবং খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ চলে। ১. গ্লাইকোজেন ঃ শরীরের ভেতরে পুঞ্জীভূত স্নেহ এবং ধমনীতে মওজুদ চর্বিকে কাজে লাগায়। ফলে, প্রথমে পুঞ্জীভূত গ্লাইকোজেনের মওজুদে প্রভাব পড়ে। এটা শেষ হলে পুঞ্জীভূত স্নেহের প্রভাব পড়ে। ২. শরীরের ভেতরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সক্রিয়ভাবে সুপ্ত রোগগুলোর চিকিৎসা শুরু করে।

রোযার ফলে কি কি রোগের চিকিৎসা হয় এবং কিভাবে একজন মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে, আমরা এ বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করবো।

প্রতিবছর বিরতিহীনভাবে একমাস রোযা রাখলে মানব শরীরের উপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে। রোযার শারীরিক ও মানসিক প্রভাব বিরাট।

১. জৈব বিষ (Toxin) ধ্বংস হয়

সারা বছর দেহের ভেতরে যে জৈব বিষ জমা হয়, রোযার দাবদাহে তা জ্বলে যায় এবং রক্ত বিশুদ্ধ হয়। শরীরে জৈব বিষ বেশি থাকা ক্ষতিকর। জৈব বিষের কারণে বিভিন্ন রোগ-শোক দেখা দেয়।

২. শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে

মিসরের জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রের প্রাণ রসায়নের শিক্ষক ডঃ আবদুল বাসেত মোহাম্মদ সাইয়েদ বলেন, যারা ভাবেন যে, রোযা রাখলে শরীর দুর্বল হয় এবং তাদের নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করা জরুরি, এটি একটি ভুল ধারণা।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, রোযা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে শরীরে বহু রোগ হতে পারে না। প্রতিরোধ ক্ষমতা আলফা-১, আলফা-২, বিটা-২ ও গামা নামক প্রোটিন থেকে সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে, রোযার ফলে এ প্রোটিনগুলো বৃদ্ধি পায়। ২৭শে রমযান এগুলো চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে, তা থেকে নীচে নামে না, বরং স্থায়ী হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ক্ষমতার দ্বিতীয় সেলটিও চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, যা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ এবং ক্যান্সার সেলকে প্রতিহত করে। এছাড়াও এর ফলে আরেকটি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। সেটি হলো রক্তের শ্বেত কনিকা। তিনি বলেন, রোযার ফলে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা ৩-৫ গুণ বাড়ে।

ডঃ আবদুল বাসেত আরো বলেন, দ্বীনী ও ধর্মীয় আবেগ বাদ দিয়ে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাকাই, তাহলে রোযা ছাড়া আর কোন উপায়ে সার্বিক ও আংশিক প্রতিরোধ কিংবা প্রোটিনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না। এমনকি প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক ওষুধ দিয়ে এক ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু তা মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যবস্থার মতো নয়।

৩. ওজন ও মেদ-ভুঁড়ি কমে এবং এযেইমার্স (ALZHEIMER'S) রোগ থেকে বাঁচা যায়

এক সপ্তাহ রোযা রাখলে ২/১ কেজি ওজন কমে। রোযার মাধ্যমে শরীরের মেদ-ভুঁড়ি কমানোর বিষয়টি শুধু ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপেও স্বীকৃত সত্য। যেখানে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর জন্য রোগীকে উপবাস রাখা হয়। বিশ্বব্যাপী এটা জানা কথা যে, বছরে শরীরে ৫০ হাজার কিলো ক্যালরী জমা হয় যা স্নেহ বা চর্বি আকারে বিদ্যমান থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর ক্যাম ফোর্ড 'সাইন্স কল ফর ফাষ্টিং' গ্রন্থে লিখেছেন, চিকিৎসকদের মতে রোযা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, শরীরের পরিপাক ও হজম প্রক্রিয়ায় এবং শারীরিক সুস্থতা বিধানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আমরা সাধারণতঃ যে খাদ্য গ্রহণ করি, তার মধ্যে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যসমূহ শরীরে সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্রান্ত হতে শোষিত হয়ে গ্লুকোজ আকার পোর্টালোশিয়া দিয়ে কলিজার মধ্যে প্রবাহিত হয়। উল্লেখ্য যে, গ্লুকোজই শরীরে তাপ ও শক্তি যোগায়।

আমাদের দেহে যতটা গ্লুকোজ তৈরি হয় তার সবটাই প্রতিদিন খরচ হয় না। কলিজা হতে কিছু গ্লুকোজ রক্তে প্রবাহিত হয়ে দেহের চালিকা শক্তিকে কর্মক্ষম রাখে। বাকী অংশ গ্লাইকোজেনরূপে কলিজা ও মাংসপেশীতে জমা হয়। কিছু অংশ অবশ্য চর্বি জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়ে দুই কিডনী, হৃদযন্ত্র Artery এব চামড়ার নীচে ও দেহের অন্য স্থানে জমা থাকে। এ সঞ্চিত গ্লুকোজ ও চর্বি জাতীয় পদার্থ উপবাসের সময় পুনরায় গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের মদ্যে প্রবাহিত হয়। দেহে সেই রূপান্তরিত গ্লুকোজের তাপ ও শক্তি উৎপাদনে ক্ষমতা দ্বিগুণ।

রোযা পালনের ফলে গ্লাইকোজেন ও চর্বি প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ হতে থাকে। ফলে দেহের সবলতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, চর্বি জমতে পারে না এবং মেদ কমে যায়।

শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় যে, রমযান মাসে প্রথম ২/৩ দিন রোযাদার শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করলেও পরবর্তীতে সে বেশ স্বাভাবিক ও সবল বোধ করে। এমনকি প্রতিদিন দুপুরের দিকে রোযাদার কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও বিকালের দিকে বেশ সুস্থতা বোধ করে। কারণ, সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ যথা সময়ে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে।

চর্বি জমে মেদ বাড়লে মানুষ মোটা হয়ে যায়। এ কারণে এযেইমার্স রোগ হয়। এযেইমার্স রোগে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। কোরআন আমাদেরকে এযেইমার্স রোগের পরিচয় জানিয়ে দিয়ে বলেছে ঃ

'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানতো সে জানা বিষয় সম্পর্কে তাদের আর জ্ঞান থাকে না।' (সূরা নহল-৭০)

বিজ্ঞান বলে, মানুষের শরীরের প্রতিটি সেল প্রতি ৭ বছর অন্তর নবায়ন হয়, কিন্তু মস্তিষ্কের সেল এর ব্যতিক্রম। কেননা, এর দুটো অংশ রয়েছে। একটি চিন্তা করে এবং দ্বিতীয়টি তথ্য জমা করে। যদি এগুলোর নবায়ন হয় তাহলে মানুষ অতীত বিহীন হয়ে যাবে। প্রতি ৭ বছরে মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, হাড়-হাড্ডি সব কিছুর নবায়ন হয়। প্রতি মিনিটে শরীরের ২.৫ মিলিয়ন লাল রক্ত কণিকা মরে যায় এবং এর পরিবর্তে নূতন রক্ত কণিকা জন্ম নেয়। মূল কথা, প্রতি ৭ বছরে মানুষ নূতন করে আরেকটি মানুষ হয়।

ইউরোপের শরীরের ভেতরে পুঞ্জিভূত ৫০ হাজার কিলোক্যালরী কমানোর জন্য ৩০ দিন গড়ে ১২ ঘণ্টা করে রোযার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। যারা কেবল সবজি খায়, তাদের শরীরে এই ক্যালরী অনেক কম। আমেরিকা ও ইউরোপে এই সমস্যা প্রকট। মুসলিম দেশগুলোতে এব্যাপারে প্রয়োজনী পরিসংখ্যান নাই। তবে শরীরের দেহ স্নেহ ও চর্বি কমানোর জন্য ইউরোপে উপর্যুক্ত চিকিৎসার পাশাপাশি দৈনিক এক ঘণ্টা হাঁটার পরামর্শ দেয়া হয়। আল্লাহ কোরআন মজীদে মানুষকে হাঁটার কথাও বলেছেন। তিনি বলেন ঃ

অর্থ ঃ 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার চতুর্দিকে হাঁট ও চলাফেরা কর এবং তাঁর দেয়া রিজিক খাও।' (সূরা মূলক-১৫)

এই সূরায় হাঁটাহাঁটি করার কথা বলা হয়েছে। অলস ও ধনী লোকেরা হাঁটে না। যারা হাড়-হাড্ডির দুর্বলতাজনিত রোগে আক্রান্ত তারা হলো অলস লোক। আরাম বাড়ার সাথে সাথে তাদের অলসতা বেড়ে যায়।

অর্ধ সাপ্তাহিক রোযা ও আইয়ামে বীদের রোযার তাৎপর্য

রমযানের রোযা ছাড়াও নবী করিম ﷺ প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তিনি বলেন, 'এ দু'দিন আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়। সে জন্য আমি চাই যে, রোযা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।'

এ ছাড়াও তিনি প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক চন্দ্র মাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখে, পিপাসার দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাকে পানি পান করানো আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যাবে।'

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পূর্ণিমার সময় চাঁদ যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন নদী ও সাগরে জোয়ার-ভাটা দেখা দেয়। সাগরের এই জোয়ার-ভাটার সাথে শুধু মানুষ নয়, বরং সকল জীবিত প্রাণীর জীবনের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

'আমরা পানি দ্বারা সকল জিনিসকে জীবিত রেখেছি।' (সূরা আম্বিয়া-৩০)

জোয়ার-ভাটার সময় মানুষের শরীরও প্রভাবিত হয়। কেননা, মানুষের গঠন প্রক্রিয়ায় ৫০-৬০ ভাগ পানি। তাই নবী করিম ﷺ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সেই প্রভাবকে কাটিয়ে তোলার জন্য রোযা রাখতেন।

প্রতি সপ্তাহে ২ দিন এবং মাসের মাঝখানে ৩ দিন করে রোযা রাখলে ৪ সপ্তাহে ৮ দিন এবং আরো ৩ দিন অর্থাৎ মাসে গড়ে ১০-১১টি রোযা হয়। রমযান ছাড়াও অন্য মাসের এক তৃতীয়াংশ রোযা রাখার এ বিধান যে কত বিজ্ঞানসম্মত, সেটা আল্লাহর রাসূল হিসেবে মহানবী ﷺ যথার্থই জানতেন। সোহবানআল্লাহ! কেউ প্রতি মাসে ১০টি রোযা রাখলে বহু রোগ বেঁচে যাবে।

৪. রোযার ফলে হজম ও পরিপাক যন্ত্রগুলো বিশ্রাম লাভ করে পতিত জমির মতো নূতন শক্তি অর্জন করে

এর ফলে রোযাদার ব্যক্তি পেটের পীড়া, অজীর্ণ ও বদহজমীসহ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পায়। রোযার মাধ্যমে কলিজায় পুঞ্জিভূত চর্বিগুলো ব্যবহারের ফলে তা কমতে থাকে। চর্বি বেশি থাকলে হজম দেরীতে হয়, ২ ঘণ্টার টা ৪ ঘণ্টায় হজম হয়। তখন ব্যক্তি নিজেকে ভারী মনে করে এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়।

রোযা কলিজার পাশে জড় হওয়া চর্বিগুলোকে উজাড় করে এবং হজম ও পরিপাক ক্রিয়া দ্রুত করে। রোযা রাখলে মাথায় চক্কর দেয়া কিংবা দিনে ঘুমের

প্রকোপ বেশি হয় বলে যারা মনে করেন, সেটা ভুল। কেননা, রোযার মধ্যে দিনে খাদ্য গ্রহণ না করলেও শরীরের বেতর মওজুদ খাদ্য ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

রোযার মধ্যে যা বন্ধ থাকে তা হলো, হজম ও চুষে নেয়ার প্রক্রিয়া। ফলে শরীরের পুঞ্জিভূত চর্বি ও অতিরিক্ত ৫০ হাজার কিলো ক্যালরীর ব্যবহার হয় এবং তা থেকে শরীর মুক্ত হয়। অনেকে রোযার অজুহাতে কাজ করতে চায় না। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আমরা যদি শেষ রতে ৪টার দিকে সেহরী খাই, তাহলে হজম ও চুষে নেয়ার প্রক্রিয়া ৬ ঘণ্টা ব্যাপী অব্যাহত থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে ৮ ঘন্টা সময়ও লাগতে পারে। এরপর রোযাদার সেহরী থেকে চুষে নেয়া ক্যালরীর উপর ৪/৫ ঘণ্টা নির্ভর করতে পারে। দুপুর ২টার পর থেকে শরীরের মধ্যে পুঞ্জিভূত ক্যালরীর ব্যবহার শুরু হয়। ফলে শরীরের খাদ্য ক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

যারা কাজ করে না তাদের খাদ্য দেরীতে হজম হয়। ফলে সে রোযার আকাঙ্ক্ষিত দৈহিক ফলাফল লাভ করতে পারে না। বরং রোযার মধ্যে কাজ আরো বেশি করতে হবে। তাই তো দেখা যায়, ইসলামের বড় বড় জিহাদগুলো যেমন বদরের যুদ্ধ ও মক্কা বিজয় রমযান মাসেই সংঘঠিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রোযা রেখে যুদ্ধ করেছেন। তারা তো দুর্বল হননি। বরং আরো শক্তি লাভ করেছেন।

৫. রোযা কিডনীতে পাথর সৃষ্টিতে বাধা দেয়

রোযার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্র বৃদ্ধি পায়। ফলে তা ক্যালসিয়ামকে জমতে বাধা দেয়। ক্যালসিয়াম জমেই পাথর সৃষ্টি হয়। কিডনীর পাথর সর্বদা প্রোটিনের কণাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে রমজানের দিনে তা গঠিত হতে পারে না। রোযার কারণে কিডনী তার দায়িত্ব ভাল ও সুসংগঠিত ভাবে পালন করে। রোযার মাধ্যমে কিডনীর Infection ভাল হয়। মূল কথা হলো, রোযা সারা বছরে বিভিন্ন সেলে জমে থাকা জৈব বিষ দূর করে। সারা বছর শরীরও তা দূর করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে এবং তারই অংশ হিসেবে চামড়ার নিচে জমা রাখে। কলিজা সে জৈবিক বিষ দূর করে সাধ্যমত শরীরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা চালায়। ঘাম এবং পেশাব-পায়খানাসহ বিভিন্ন উপায়ে তা শরীর থেকে বের হয়। রোযাও নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তাই করে।

৬. চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

রোযার কারণে দিনে শরীরে পানির পরিমাণ কমে যায়। ফলে, চামড়াতেও পানির অংশ কমে থাকে। এর ফলে চামড়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। যাদের মুখে ব্রণ

উঠে, রোযার কারণে তা সেরে যায়। ডঃ রবার্টের মতে, রোযা সে সকল মাইক্রোব ধ্বংস করে যা বিভিন্ন সেলকে আক্রমণ করে। ফলে তা নূতন করে গঠিত হয়।

চিকিৎসা বিশ্বকোষে 'খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা' অধ্যায়ে আছে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বলা হয় যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন, মাসে এক সপ্তাহ এবং বছরে এক মাস রোযা রাখা উত্তম। চিকিৎসা ও সার্জারীতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ আলেকসিস কারিল, তার 'মানুষ ঃ অজ্ঞাত' নামক বইতে লিখেছেন, অধিক খাদ্য গ্রহণ মানব জাতির অস্তিত্বের ধ্বংসের একটি বড় কারণ। মানুষের শরীরের গঠন হলো কম খাদ্য গ্রহণের উপযোগী। ভোজন কমানোর জন্য অতীত ইতিহাসে লোকেরা উপবাস থাকত। দুর্ভিক্ষ না থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের উপর কম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে।[১]

৭. বাত রোগের চিকিৎসা

আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ ম্যাক ভাডন বলেন,[২] রোযার কারণে বাত রোগের আরোগ্য হয়। অন্যান্যদের মতে, শরীরের বিভিন্ন জোড়ার জোড়ার সংক্রামক রোগেও আরোগ্য হয়। কলিজার Infectionও সেরে যায়। পাকিস্তানের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ মোহাম্মদ হোসেনেরও এই একই মত।

৮. রক্তে কোলেস্টেরল কমায়

যাদের রক্তে চর্বির হার বেশি, এক সপ্তাহ রোযা রাখলে কোলেস্টেরল কমে আসবে। কেননা, রোযার মাধ্যমে চর্বি ক্ষয় হয় এবং শরীর থেকে চর্বি কমে গেলে রক্তেও তা কমে যায় ফলে তা হৃদরোগ ও উচ্চ রক্ত চাপের রোগের জন্য খুবই আরামপ্রদ। তবে সেহরী ও ইফতারে বেশি ও সমৃদ্ধ খাবার খেলে রক্তে কোলেস্টেরল না কমে আরো বাড়তে পারে। উচ্চ রক্ত চাপের অন্যান্য কারণও আছে। যেমন, মানসিক দুশ্চিন্তা, চাপ, পেরেশানী ইত্যাদি। কিন্তু রমযানের রূহানী ও আত্মিক নির্মল পরিবেশের কারণে সে সকল জিনিসও কমে আসে। ফলে, এ জাতীয় রোগীরা আরামে থাকে। সব কোলেস্টেরলই ক্ষতিকর নয়। প্রধানতঃ দুই প্রকারের কোলেস্টেরল আছে– (ক) উপকারী কোলেস্টেরল যেমন, DHL (high density lipoprotein) এবং (খ) ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল যেমন, (LDL (Low density Lipoprotein). অতিরিক্ত LDL হৃদরোগ সৃষ্টি করে। বেশি HDL হৃদরোগ থেকে হেফাজত করে। মোটকথা, রোযার সার্বিক বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় মেদবহুলতা কমে যায় এবং LDL ও HDL এর সুস্থ ভারসাম্য বজায় থাকে।"[২]

---

১. সাপ্তাহিক আদ্-দাওয়াহ, ১৫ই জানুয়ারি ১৯৯৮, রিয়াদ, সৌদি আরব। ২. প্রাগুক্ত।
২. (Lipid and Lipid Disorders by Michael D. Feher William Richmond)

এক মাসের সিয়াম সাধনায় লিপিড প্রোফাইল ইতিবাচক দিকে মোড় নেয়। ভাল কোলেস্টেরল অর্থাৎ HDL এর মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল অর্থাৎ LDL এর মাত্রা কমে যায়। লিপিড প্রোফাইল নেতিবাচক দিকে মোড় নিলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৯. রক্ত স্বল্পতা ও রক্ত শূন্যতা দূর হয়

রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার অনুভূতি সৃষ্টি হলে শরীরে সঞ্চিত লৌহ জাতীয় পদার্থ নির্গত হয় এবং তা রক্তের স্বল্পতা বা রক্ত শূন্যতা পূরণ করে।

১০. কঠোর স্নায়ু ব্যথার উপশম হয়

মাত্র তিন সপ্তাহ রোযা দ্বারা কঠিন স্নায়ু ব্যথার আরোগ্য হয়।

১১. ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে

রোযা ডায়াবেটিস রোগের জন্য বিরাট রহমত। কম খাদ্য গ্রহণ এবং দীর্ঘ সময় খাদ্য গ্রহণ না করায় রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে আসে। ফলে, রোগ নিয়ন্ত্রিত থাকে। ঔষুধ সেবনকারী রোগীদের অনেকেরই ঔষুধ সেবনের দরকার হয় না। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে রোযা রেখে হাঁটলে ডায়াবেটিস আরো নিয়ন্ত্রিত থাকে।

যে সমস্ত ডায়াবেটিস রোগী Diet Control-এ সুস্থ আছেন তাদের জন্য রোযা এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু যে সমস্ত রোগী ট্যাবলেট ব্যবহার করেন তাদেরকে রোযা রাখার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। আর যারা ইনসুলিন ব্যবহার করেন তাদেরকেও রোযার সময় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তার তাদেরকে ইনসুলিনের ধরন ও মাত্রা ঠিক করে দেবেন। তবে ইনসুলিন নির্ভর রোগীর রোযা ঝুঁকিমুক্ত নয়।

১২. রোযা সকল Infection এবং টিউমারের জন্য প্রতিরোধক

নারীদের বিভিন্ন রোগের Infection-কেও প্রতিহত করে। মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকলে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয় না। রোযার কারণে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। সে কারণে আরোগ্য লাভ করা যায়।

১৩. হায়াত বাড়ে ও বার্ধক্য দেরীতে আসে

ইঁদুর ও খরগোশের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, রোযা পালনকারী প্রাণীটিকে অল্প খাবার দেয়ায় সে বেশি খাবার গ্রহণকারী প্রাণীর তুলনায় তিন গুণ বেশি বয়স পেয়েছে।[১]

---

১. দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮।

সম্প্রতি ৮০ বছর বয়স্ক ২৫০০ নারী-পুরুষের উপর জৈবিক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। সে পরীক্ষার ফলাফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এতে দেখা যায় যে, মানুষের বয়স আরো ৫০ বছর বেড়ে যেতে পারে।[১]

ইসলাম বার্ধক্যের কোন সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। বরং বৃদ্ধের অন্তর যুবকের অন্তরের মতই সমানভাবে পেতে চায়। নবী করিম ﷺ বলেন ঃ

'বৃদ্ধের মন, বয়স বৃদ্ধি ও সম্পদের প্রাচুর্য লাভের আগ্রহের ব্যাপারে যুবক।' (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

'দুনিয়াপ্রীতি ও লম্বা আশার ব্যাপারে বয়স্কদের হৃদয় অব্যাহতভাবে যুবক।' (বোখারী)

১৪. পুরুষ হরমোন বৃদ্ধি পায়

১৯৮৬ সনে পুরুষ হরমোন বিষয়ক ম্যাগাজিন Archieves of Andrology-তে জেদ্দার বাদশাহ ফাহাদ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও হাসপাতালে নারী রোগ, ডেলীভারী ও বন্ধ্যাত্ব দূরকরণ বিষয়ক কনসালটেন্ট ডঃ সামীর আব্বাস ও ডঃ আবদুল্লাহ বাসালামার একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারা ২১ জন রোগীর উপর গবেষণা চালান। এদের মধ্যে ১০ জনের শুক্রকীট ঘটিত সমস্যা, তিন জনের অন্ডকোষ বিলকুল শুক্রকীট শূন্য এবং ১০ জন সুস্থ লোক। রযমান এবং রমযানের আগে-পরে অর্থাৎ শাবান ও শাওয়ালসহ তিন মাসে তাদের রক্ত ও বীর্যের নমুনা দেওয়া হয়। তারা তাতে Testosteron, Prolactin, FSH ও LH, হরমোনের মাত্রা জানার চেষ্টা করেন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, রমযান মাসে FSH এবং LH হরমোন অনেক বেড়ে গেছে। তারা স্বাভাবিক লোকদের থেকে নেয়া নমুনায় Testosteron নামক পুরুষ হরমোনের উত্তম কার্যক্রম লক্ষ্য করেছেন। তারা রমযান পরবর্তী শাওয়াল মাসে নারীর গর্ভধারণের সংখ্যা বৃদ্ধিও দেখতে পেয়েছেন। তাদের মতে রোযা পুরুষ হরমোন গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্য আরেক গবেষণায় বলা হয়েছে, রোযার ফলে হরমোনের বাড়তি-ঘাটতি কোনটাই হয় না।

---

২. সাপ্তাহিক আল-আলম ইসলামী, ৩রা নভেম্বর-২০০৩, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মোকাররমা।

১৫. দাঁত ও মাড়ির উপকার হয়

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ হ্যামিলটন ও তার সাথীরা ১ হাজার নারী-পুরুষের উপর গবেষণা চালিয়েছেন। তারা সাবই স্বেচ্ছায় সপ্তাহে একদিন উপবাস করে। ফলে, তাদের দাঁতের অবস্থার উন্নতি হয়। কেননা, খাদ্য থেকে বিরত থাকার কারণে দাঁতও বিরতি লাভ করে। সপ্তাহে একদিন দাঁতের গোড়ায় খাদ্যের অবশিষ্ট কণা না থাকায় এর ভূমিকা উন্নত হয়। এছাড়াও একদিন খাদ্য না করায় পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র বিশ্রাম ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যায়।

১৬. পেপটিক আলসার হ্রাস পায়

লন্ডন থেকে লেউইস এন্ড কোম্পানী লিমিটেডের প্রকাশিত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ এফ. এম. গ্রিমীর লিখিত 'প্র্যাকটিস অব সার্জারী' বইতে উল্লেখ আছে যে, পাকস্থলীতে প্যারাইটাল কোষের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ কোটি। এই কোষ হতে প্রতিনিয়ত আইসাটনিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হয়। যে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জন্য পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডিনাল আলসার হয়, সেই এডিস সাধারণতঃ আহারের পরপরই বেশি নির্গত হয়। অপর দিকে পরকস্থলী খালি থাকলে ঐ এসিড কম নির্গত হয়।

১৯৬৭ সালে, করাচির এক প্যাথলজি ল্যাবরেটরীতে গ্যাস্ট্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা প্রমাণীত হয়। পরীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেহরী খাওয়ানো হয়। তারপর তাকে ১০ ঘণ্টা উপবাস রাখা হয়। গ্যাষ্ট্রিক পরীক্ষা করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রোযা অবস্থায় পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সবচইতে কম পাওয়া যায়। সুতরাং রোযায় এসিড কমে, বাড়ে না। যারা পেপটিক আলসারের কথা বলে রোযা না রাখার বাহানা করে, তাদের সে বাহানা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

মূলতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন গ্রন্থেই একথা লেখা নেই যে, পেপটিক আলসারের যতগুলো কারণ আছে, রোযা বা উপবাস তার অন্যতম। বরং পেপটিক আলসারের রোগীকে অস্ত্রোপচারের আগে উপবাস রাখা হয়।[১] Gastritis এবং IBS ইত্যাদি রোগের জন্য উপকারী।

সিলেট মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডাঃ গোলাম মুয়ায্যাম ১৯৬০ সালে 'মানব শরীরের উপর রোযার প্রভাব' শীর্ষক গবেষণা চালান। গবেষণার

১. সৌজন্যের মাসিক মদীনা-নভেম্বর ২০০৩, ঢাকা। ২. প্রাগুক্ত।

ফলাফলে দেখা যায়, রোযা দ্বারা শরীরের ওজন সামান্য হ্রাস পায় বটে, তবে তা শরীরের কোন ক্ষতি করে না, বরং তা শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমানোর ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা বেশি কার্যকর। তিনি আরো বলেন, রোযা রাখলে গ্যাস্ট্রিক বাড়ে না। বরং এসিড কমে যায়। খাদ্য গ্রহণে গ্যাস্ট্রিক বাড়ে।[১]

তবে যাদের Active peptic ulcer অথবা Bleeding peptic ulcer আছে, তাদের জন্য রোযা না রাখার শরয়ী' ওজর গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এ জাতীয় রোগী রোযা ভাঙ্গতে পারে।

১৭. তারবাহীর নামায মেরুদণ্ডের Flexibility বাড়ায়

মিশরের হালওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ডঃ সালওয়া রুশদী ৬০ বছর বয়সোর্ধ নারী ও পুরুষের উপর ৪ বছর ব্যাপী প্রতি বছরে একমাস করে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, তারাবীহর নামায হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা ও শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শরীরের মাংশ পেশীতে শক্তিশালী করে। মেরুদণ্ডসহ অন্যান্য জোড়াগুলোকে নমনীয় করে এবং রক্ত প্রবাহকে অধিক ক্রিয়াশীল করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের Muscle pain ও Joint point আছে, রমযানের পর তাদের ব্যথা অনেক কমে গেছে। তিনি বলেন, রোযা ও তারাবীহ আল্লাহর বিধান হওয়ায় তা পৃথিবীর অন্য কোন Physio অপেক্ষা উত্তম। তিনি বলেন, নামাযে শরীরের সকল জয়েন্ট এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট মাংশপেশীগুলো দাঁড়ানো, রুকু, সাজদা ও বসার মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। ফলে রক্ত চলাচলে ও শ্বাস গ্রহণ প্রক্রিয়ার মান বৃদ্ধি পায়। গবেষক বলেছেন, পিঠে, জয়েন্টে এবং মাংশপেশীতে যত ব্যথা বেদনাই থাকুক, প্রত্যেকের উচিত তারাবীহ নামায পড়া। রুকু সাজদায় গেলে মাথা ও মগজে রক্ত দ্রুত প্রবাহিত হয়। ফলে, সচেতনতা ও একাগ্রতা বাড়ে।

১৮. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়

ডঃ সালওয়া রুশদী তার গবেষণায় আরো বলেছেন, কেউ যদি বিভিন্ন কারণে ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয় এবং তাতে যাদ মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটে, পুরো এক মাস তারাবীহর নামায পড়ার পর তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

---

১. সৌজন্যের মাসিক মদীনা-নভেম্বর ২০০৩, ঢাকা।

রমযান রূহানী পরিবেশ, তাহাজ্জুদের নামায ও নেক কাজের মওসূম বিধায়, বেহেশতী পরিবেশ বিরাজ করে এবং বুঝে অধিক কোরআন পড়ার কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রত্যাশিত। রোযা ইচ্ছা শক্তিকে শক্তিশালী করে যা মানসিক রোগীর চিকিৎসায় সহায়ক। পানাহারের ইচ্ছা থেকে বিরত থাকায় তা শক্তিশালী হয়। রমযান সম্পর্কে অধ্যক্ষ ডি. এফ. ফোর্ডের মত হলো, রোযা আত্মশুদ্ধি ও সংযমের অন্যতম উপায়। এর মধ্যে স্রষ্টাকে পাওয়া যায় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। হিংসা-বিদ্বেষ ও মন্দ স্বভাব হতে দূরে থাকা যায় এবং কুপ্রবৃত্তিকে পরাভূত করা যায়। (সাইন্স ফর ফার্স্টি বই দ্রষ্টব্য)

১৯. যৌন রোগ থেকে বাঁচা যায়

রোযার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অর্জন করে। ফলে, তারা যেন-ব্যভিচার থেকে বিরত থাকে। যিনা-ব্যভিচারের ফলেই আজ এইডস রোগের বিশাল আক্রমণ। তাই দেখা যায়, ১০ম ও ১১শ খৃষ্টাব্দে, মুসলিম চিকিৎসকরা সিফিলিস রোগের চিকিৎসার জন্য রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশর দখলের পর হাসপাতালগুলোতে যৌন রোগের চিকিৎসার জন্য রোযার হুকুম দিয়েছিলেন। মুসলমান ডাক্তাররা বসন্ত রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য তিন সপ্তাহ রোযা রাখার কথা বলেছেন। প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা যেকোন পুরাতন রোগ থেকে মুক্তির জন্য রোযা রাখার কথা বলতেন।

২০. স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে

রোযার মধ্যে দিনে ধুমপান চা ও কফির মতো উত্তেজক জিনিস সেবন না করায় স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে। ফলে, ব্যক্তির মন মেজাজ ভাল থাকে এবং গঠনমূলক চিন্তা-বাবনা করার সুযোগ বেশি পায়। উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে অনেক সময় আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

২১. রমযান মাসে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যার পরিমাণ হ্রাস পায়

রহমত ও বরকতের মাসের আধ্যাত্মিক ফসল হিসেবে লোকেরা আত্মহত্যা করার চিন্তা করে না। এ মাসে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে কিংবা ব্রেইন স্ট্রোক করে মৃত্যুর হারও বাড়ে না।

যাদের রোযা রাখলে ক্ষতি হবে বলে চিকিৎসকরা বলেন, তাদের রোযা রাখা ঠিক নয়। এর ফলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। যেমন, যাদের উচ্চ রক্তচাপ খুব বেশি, যাদের প্রতিষ্ঠিত হৃদরোগ আছে, বাইপাস সার্জারী করা হয়েছে, কিংবা পেসমেকার সংযুক্ত আছে, তাদের রোযা না রাখাই উত্তম। তবে যাদের সহনীয় রক্তচাপ ও মদে আছে তাদের জন্য রোযা খুবই উপকারী। ১ কেজি বাড়তি ওজন কমাতে পারলে প্রায় দেড় মিলিমিটার অফ মার্কারী Diastolic Pressuree কমানো যায়।

ডাইরিয়াজনিত রোগে রোযা না রাখাই উত্তম। কেননা, এর ফলে পানি শূন্যতার মারাত্মক অসুবিধে হতে পারে। দুশ্চিন্তাজনিত মাথা ব্যথার রোগীর জন্য রোযা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। রক্তে শর্করা কমলে মাথা ব্যথা বৃদ্ধি পাবে। মাগ্রেনজনিত মাথা ব্যথা হলে রোযা না রাখা উত্তম। শারীরিক ও মানসিক চাপে বেশি Catecholanine নিঃসরণে মাথা ব্যথা বাড়তে পারে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের রোযার কারণে সমস্যা হবে রোযা ভাঙ্গতে পারবে এবং পরে তারা কাযা রোযা করলেই হবে। বয়ঃবৃদ্ধের প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন ফকীর মিসকীনকে দিনে দু'বেলা করে খাবার দিলেই চলবে। তাদের রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। শরীরের কোন ক্ষতি না হলে কোন বৃদ্ধ লোকও রোযা রাখতে পারবেন।

১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে রাশিয়ার চিকিৎসকরা রোযার মাধ্যমে রক্তের ক্যান্সার, চোখের অসুখ, দাঁতের মাড়ি ফুলে যাওয়া ও রক্তক্ষরণ এবং আলসারের চিকিৎসা করতেন। ১৭৬৯ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ পিটার ভেনিয়ামিনভ এক রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে অসুখের সময় রোগীদেরকে খাদ্য থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। তার যুক্তি ছিল, রোযার কারণে পরিপাকতন্ত্র একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশ্রাম পায়। ফলে, সুস্থ হওয়ার পর তা ঠিকমত হজম কাজ চালাতে পারে।

এরপর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ডঃ পি. জি স্পাসকী বলেন, রোযার মাধ্যমে কালোজ্বর এবং শরীরের ভেতরের অন্যান্য পুরাতন রোগ বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভাল হতে পারে।

ইটালীর নেপল শহরের ডাঃ লোদভীক কারনারো ৮৩ বছর বয়সে নিজে রোযা রেখে রোযার উপকারীতার উপর এক গবেষণায় বলেছেন, হে অসহায় ইটালী, তুমি

কি দেখ না, তোমার দেশের নাগরিকরা খাওয়ার চাহিদা ও আগ্রহ পুরা করতে গিয়ে অন্য যে কোন সংক্রামক রোগ কিংবা যুদ্ধ অপেক্ষা আরো বেশি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে? বেশি খাদ্য গ্রহণ মারাত্মক যুদ্ধের ফলাফল অপেক্ষাও বেশি ধ্বংসাত্মক। শরীরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন এবং উপযোগী ততটুকুর বেশি খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। আমরা বেশি ভোজনে আনন্দ লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত এর বিরাট মূল্য আদায় করতে হবে। কোন কোন সময় সে মূল্য মৃত্যুও হতে পারে।

বৃটিশ ডাঃ তাশিন (১৬৭১-১৭৪৩) বলেন, প্রোটেস্ট্যন্ট খৃস্টানরা বেশি ভোজন করে। তিনি রোযার মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, যেসব ডাক্তাররা রোগীকে অধিক খাদ্য গ্রহণের কুফলের বিরুদ্ধে সতর্ক করে না তাদেরকে কি সমাজ এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না?

জার্মানীর ডাক্তার ফেডারিক হভম্যান (১৬৬০-১৭২৪) বলেন, রোযার মাধ্যমে মৃগীরোগ ও আলসারের চিকিৎসা করা যায়।

রোযার উপকারিতা যারা ডাক্তার নয় তারাও বুঝতে পারে। বিশেষ করে পেটের অসুখ, অজীর্ণ, বদহজমী ও গ্যাস্ট্রিকের রোগীরাতো পরিষ্কারভাবে তা বুঝতে পারে।

আমরা দেখেছি, ভারতের নেহেরু গান্ধী গোটা জীবন রোযায় অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি তার অনুসারীদেরকে বলেন, রোযার মাধ্যমে আত্মসংযম বাড়ে এবং মানবাত্মা পবিত্রতা অর্জন করে।

ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী মাইকেল এংলো ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ৯০ বছর বয়স পার হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্মক্ষম ও কর্মঠ ছিলেন। তাকে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আমি বহু আগ থেকেই মাঝে মাঝে রোযা রেখে আসছি। আমি প্রত্যেক বছর ১ মাস, প্রত্যেক মাসে ১ সপ্তাহ রোযা রাখছি এবং দিনে তিন বেলার পরিবর্তে দু'বেলা খাবার খাই।

আমেরিকার চিন্তাবিদ গ্রেগরি ইউনিভার্সিটি কলেজ ও ক্লাবে এবং টেলিভিশনে তার শ্রোতাদেরকে বলেন, রোযার মাধ্যমে শরীরের পবিত্রতা অর্জন হয় এবং শরীরের ক্ষতিকর জিনিসগুলো দূর হয়।

মস্কোর মানসিক রোগ ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ডঃ ইকোলাইড বিগত ৫০ বছরে মাসে মাসে রোযা রাখতেন। তাকে বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, মঙ্গোলিয়ায় ডাইনোসরের ডিম প্রাপ্তি, সৌরশক্তির মাধ্যমে ঘড়ি চালানো,

টেলিভিশন, পরমাণু শক্তি ও হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার? তিনি উত্তরে বলেন, সেটা হলো রোযার মাধ্যমে বয়স্ক লোকদেরকে যুবকের শারীরিক বুদ্ধি-বিবেক ও আত্মিক শক্তি ফিরিয়ে দেয়া এবং বার্ধক্যের উপকরণগুলোকে বাধাগ্রস্ত করা। আমি ৮৫ বছর বয়সেও নিজ মাথার উপর সহজে দাঁড়াতে পারি, আমার চাইতে কম বয়সের লোকেরাও এ কঠিন ব্যায়ামে অপারগ।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের রোথাকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক উইলিয়াম এম বলেন, আমি বহু বছর যাবত মাসে মাসে রোযা রাখি, যদিও আমার বয়স বেশি হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার জীবনের সোনালী দিনগুলো নষ্ট হয়নি। আমি খুবই সুস্থ জীবন-যাপন করছি।

কলাম্বিয়ার সাংবাদিক স্কুলের টার্ন ব্রাঞ্জ বলেন, রোযার শারীরিক ফায়দা অপেক্ষা আত্মিক ফায়দা বেশি। আমি যদিও শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য রোযা রাখি, কিন্তু আমি দেখি যে, রোযা আমর চিন্তার জন্য উপকারী। আমি নতুন নতুন চিন্তা করতে পারি কোন জিনিসকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

চিকিৎসা বিষয়ক রোযার উপর গবেষণাকারী মার্কিন চিকিৎসক ডঃ এলানকোর্ট বলেন, মস্কোর মানসিক রোগ চিকিৎসক ইনস্টিটিউটের রোযা ইউনিটের পরিচালক ইউরি নিকোলায়েভ বলেছেন, শহরে গাড়ীর ধুঁয়া ও কল-কারখানার বাষ্প ও ধুঁয়ার পরিবেশ দূষণ বসবাসকারীদের জন্য রোযা খুবই মৌলিক চিকিৎসা। ডঃ এলানকোট এবং তার অন্য ডাক্তার সঙ্গী কন্টিকাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মারশাল মন্ডেল এবং তার মেসাসুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উইলিয়াম বিলপোট শিশুদেরকে মস্তিষ্ক বিষয়ক এলার্জির জন্য রোযার মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। শরীরের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বাঁচানোর জন্য তারা ঐ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।[১]

দৃষ্টি আকর্ষণ

রোযার উপর গবেষণার সংখ্যা খুবই কম। মুসলিম ডাক্তাদেরকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং আল্লাহর বিধান যে বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের জন্য উপকারী তা প্রমাণ করে দিতে হবে।

১. সাপ্তাহিক আল আলম ইসলামী, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা, ১০ই নভেম্বর ২০০৩।